ইউনিট ৪

সমাজ ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান

ভূমিকা

মানব সমাজে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই মানুষে যখন একত্রে বসবাস শুরু করেছিল তখন থেকেই জীবন পরিচালনার স্বার্থে পর্যায়ক্রমে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। অতীতকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত যে সব প্রতিষ্ঠান সার্বজনীন ও সমাজের মৌলিক একক হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে। বিবাহ, পরিবার জ্ঞাতিসর্ম্পক, জনসমষ্টি, রাষ্ট্র এবং ধর্ম। উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কার্যাবলী পরিচালার ক্ষেত্রে, সমাজের আদর্শ মূল্যবোধ, রীতিনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বোপরি সমাজের স্থায়ীত্ব ও সু-শৃংখল পরিচালনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এইসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ একে অপরের পরিপূরক। যেমন- বিবাহের মাধ্যমে মানুষ যৌন সম্পর্কের সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে থাকে, এই যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে যে সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন, তা পরিবার করে থাকে। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে জ্ঞাতি সম্পর্ক। জ্ঞাতি সম্পর্ক মানুষের বংশগতি পরিচয় ও মর্যাদা দিয়ে থাকে, বিশেষ করে সম্পত্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অপরিসীম। সমাজ কাঠামো সৃষ্টি হয় জ্ঞাতি সম্পর্কের ভিত্তিতে - যা কিনা একটি জনসমষ্টির মধ্যে একই রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ঐতিহ্য, সামাজিক আদর্শ ও জনস্বার্থে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। আবার জনসমষ্টির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থ সংরক্ষণ, শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা, এবং জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে প্রয়োজন রাষ্ট্রের। আধুনিককালে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনহিতকরসহ সকল ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বিবাহ পরিবার জ্ঞাতিসম্পর্ক রাষ্ট্র জনসমষ্টি প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে থাকে গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান তা হচ্ছে ধর্ম। ধর্মের ব্যর্থতা মানবসভ্যতাকে বহুলাংশে বিপন্ন করে তোলে। ব্যক্তি জীবনে এবং সমাজজীবনে ধর্মের অস্তিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারকার্যে শপথ গ্রহণের যে রীতি পরিলক্ষিত হয় সে ক্ষেত্রেও ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্ব লক্ষ্যনীয়। এই ইউনিটের পাঠশেষে আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন। (ক) বিবাহ (খ) পরিবার (গ) জ্ঞাতি সম্পর্ক (ঘ) জনসমষ্টি (ঙ) ধর্ম এবং (চ) রাষ্ট্র সম্পর্কিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হল-

পাঠ-৪.১ ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ
পাঠ-৪.২ ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার
পাঠ-৪.৩ ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জ্ঞাতিসম্পর্ক
পাঠ-৪.৪ ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনসমষ্টি
পাঠ-৪.৫ ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্ম
পাঠ-৪.৬ ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র।

পাঠ-৪.১ ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি বলতে পারবেন-

- ☞ ৪.১ঃ১ বিবাহ কী/ বিবাহের সংজ্ঞা
- ☞ ৪.১ঃ২ বিবাহের শ্রেণী বিভাগ বা প্রকারভেদ
- ☞ ৪.১ঃ৩ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহের গুরুত্ব।

৪.১ঃ১ বিবাহ কি?

বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্নকালে পরিবার প্রথার পার্থক্য এবং বিবাহ ব্যবস্থার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দেশ কাল ভেদে এই পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহের সংজ্ঞা সম্পর্কে মত পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। সাধারণভাবে বিবাহ হল নারী পুরুষের মধ্যে যৌন মিলনের এক সমাজ অনুমোদিত উপায় এবং এক ধরনের চুক্তি। সুতরাং বিবাহ হলো নারী ও পুরুষের যৌন সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য অনুসৃত এক সমাজ স্বীকৃত ব্যবস্থা বিশেষ। বিবাহ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে মোটামোটি স্থায়ী বন্ধন। তবে বিবাহের জৈবিক ও সামাজিক উভয় দিকই দিয়ে সর্বজন গৃহীত ও অপেক্ষাকৃত ব্যাপক পরিধি হিসেবে সংজ্ঞা দিয়েছেন এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক তাঁর "History of Human Marrige" শীর্ষক গ্রন্থে বিবাহ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, "বিবাহ হল এক বা একাধিক পুরুষের সংঙ্গে এক বা একাধিক স্ত্রীলোকের প্রথা আইন কর্তৃক স্বীকৃত এমন একটি সম্পর্ক যা বিবাহিত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের সন্তান সমূহের জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলো অধিকার ও কর্তব্যের সৃষ্টি করে"। সুতরাং এক কথায় বলা যায় যে, ----- "বিবাহ হচ্ছে নারী ও পুর□ষের *মধ্যে মোটামুটি স্থায়ী সামাজিক চুক্তি বা যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণ* এবং পারিবারিক দায়িত্ব বহন করে"।

৪.১ঃ২ বিবাহের শ্রেণীবিভাগ

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিবাহের প্রকৃতি ও প্রসারের পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীনকালে আদিম সমাজে বিবাহ ব্যবস্থা কেমন ছিল তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। আবার সে সময় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ কেমন ধরনের বিবাহ প্রথা অনুসরণ করত তার ধরণ সম্পর্কেও সকলে একমত নয়। কারণ ঐতিহ্য আদর্শ ও প্রয়োজন সর্বত্র এক ও অভিন্ন নয়। সেজন্য দেশ কাল পাত্র ভেদে বিবাহ বিষয়ক রীতিনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের আচার অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন। এসব দিক বিচার করে বিভিন্নভাবে বিবাহের প্রকারভেদ করা হয়। প্রাথমিকভাবে বিবাহকে ২ ভাগে বিভক্ত করা হয়।

(১) একক বিবাহ (২) বহু বিবাহ

১. একক বিবাহ ঃ একক বিবাহের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর দাম্পত্য জীবনকে বোঝায়। অর্থাৎ যখন একজন পুরুষ ও একজন নারী মিলে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে তাকে বলা হয় একক বিবাহ গাতা। অনেক চিন্তাবিদ একক গামিতাকে মানব পরিবারের আদিরূপ বলে মনে করেন। এদের মধ্যে হচ্ছে ওয়েস্টমার্ক ও জিল বার্ট প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বর্তমানে এক বিবাহ সর্বজন স্বীকৃত এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যবস্থা। বহুদেশে একক গামিতাকে একমাত্র বিবাহ হিসাবে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একক গামিতা পরিবারের সুবিধা হচ্ছে -

ক. এক বিবাহের মাধ্যমে যে পরিবার সৃষ্টি হয় তাতে অধিক নিরাপত্তাবোধ ও স্থায়ীত্বের সৃষ্টি হয়।

খ. পরিবারের স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন গভীর ভালবাসা ও আীষ্মতাবোধের সৃষ্টি হয় এবং তা বজায় থাকে।

গ. সন্তান জন্মদান, লালন-পালন বৃদ্ধদের নিরাপত্তাদান।

ঘ. সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং হস্তান্তর রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক গামিতা বিবাহের সুফল অনস্বীকার্য।

প্রকৃত অর্থে বিভিন্ন দেশের সমাজ ব্যবস্থায় আইনানুসারে এক গামিতাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মাবলীদের ক্ষেত্রেও সময়ে চারজন স্ত্রী গ্রহণের সুযোগ থাকলেও অধিকাংশই মুসলমান সাধারণত একযোগে চারজন স্ত্রী রাখে না। অর্থাৎ বাংলাদেশের অধিকাংশই মানুষই এক বিবাহে বিশ্বাসী, ক্ষেত্র বিশেষে দ্বিতীয় বিবাহ করে থাকে।

২. বহুবিবাহ ঃ বহু গামিতা বলতে নারী বা পুরুষের একাধিক জনের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করাকে বোঝায়। অর্থাৎ বহুগামিতা হলো এমন এক বিবাহ ব্যবস্থা একজন নারী বা পুরুষ একই সময়ে একাধিক পুরুষ বা নারীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করতে পারে। বহুবিবাহ দু'ধরণের। (ক) বহু পতিত্ব (খ) বহুপত্নীত্ব

(ক) বহুপতিত্ব ঃ বহুপতিত্ব হল এমন এক বিবাহ প্রথা যার দ্বারা একজন নারী বহু পতির সঙ্গে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে। অর্থাৎ একইকালে এক নারীর বহুপতি গ্রহণের প্রথাকে বলা হয় বহুপতিত্ব। বহুবিবাহের এই প্রথা খুব একটা দেখা যায় না, তবে ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর আরও কয়েকটি দেশে সীমিতভাবে প্রচলিত আছে। বহু পতিত্ব আবার দু'ধরনের হতে পারে -

১. এক বহুপতিত্ব আছে যেখানে পত্নিরা এক্ষেত্রে একই পরিবারের সদস্যরা (ভাইয়েরা) একজন স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ ধরনের বহু পতিত্বকে ইংরেজীতে Adelphic Polyandry বা Fraternal Polyandry বলা হয়।
২. বহুপতিত্ব বিবাহের দ্বিতীয় ধরনটি হচ্ছে একজন স্ত্রীলোকের বহুপতি আছে কিন্তু পতিদের মধ্যে কোন রক্তের সম্পর্ক থাকে না। পত্নী তাঁর মায়ের বাড়ীতে থাকেই, পতীর পালা বাড়ীতের আসে এবং পর্যায়ক্রমে সহবাস করে। এভাবে যে সন্তান উৎপাদন হবে তা বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার পিতা যে কোন একজনকে বেছে নিবে। এই ধরনের বহুপতিত্বকে ইংরেজীতে Nair Polyandry নামে অভিহিত করা হয়।

(খ) একজন পুরুষ একই সংগে একাধিক নারীর সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলে তাকে বলা হয় বহুপত্নীত্ব অর্থাৎ একজন পুরুষ একই সঙ্গে বহু নারীর সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, বহুপত্নীত্ব বিবাহে একজন পুরুষ বহু নারীকে বিবাহ করে কিন্তু সকল স্ত্রীর মর্যাদা সমান হয় না এবং বহুপত্নীক বিবাহে পত্নীরা সবাই সহোদর ভগ্নী হতে পারে। এ ধরনের বিবাহ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ও ভারতে বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত আছে।

উপরন্তু বিবাহের শ্রেণীবিভাগ ছাড়া আরেক ধরনের বিবাহের অস্তিত্ব অতীতে ছিল তা হচেছ -

গোষ্ঠী বিবাহ ঃ গোষ্ঠী বিবাহ হচ্ছে একাধিক পুরুষের সঙ্গে একাধিক নারীর একই সময়ে যে বিবাহ সম্পাদিত হয়ে থাকে। গোষ্ঠী বিবাহের ক্ষেত্রে একটি পরিবারের গোষ্ঠীর সাথে সকল পুরুষই হল অপর একটি গোষ্ঠীর সকল নারীর স্বামী। আবার বিপরীতক্রমে একটি গোষ্ঠীর সব নারী হল অন্য গোষ্ঠীর সব পুরুষের স্ত্রী। সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় এ ধরনের বিবাহ প্রথা একেবারে অপ্রচলিত। তবে ব্রাজিল, হাওহাই দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়ার উপজাতীদের মধ্যে দেখা যায়।

আধুনিককালে বিবাহের শ্রেণী বিভাগ ঃ আধুনিককালে সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহকে ২ ভাগে ভাগ করা যায় (ক) স্থিরীকৃত বিবাহ এবং (খ) রোমান্টিক বিবাহ

(ক) স্থিরীকৃত বিবাহ ঃ

যখন কোন বিবাহের ক্ষেত্রে পিতামাতা বা অভিভাবকগণ পাত্র অথবা পাত্রী নির্বাচন করেন এবং তাঁরাই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে থাকেন তখন তাকে স্থিরীকৃত বিবাহ বলা হয়। স্থিরীকৃত বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র পাত্রীর উভয় পক্ষের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও মর্যাদা বিচার বিবেচনা, উভয় পরিবারের পারস্পরিক সুবিধা ও স্বার্থের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। এ বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত ইচ্ছ অনিচ্ছা, অভিপ্রায়, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদিকে প্রায় পুরোপুরি উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করা হয়।

(খ) রোমান্টিক বিবাহ ঃ

যখন কোন বিবাহ পাত্র-পাত্রী স্বাধীন ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়ে থাকে তখন তাকে রোমান্টিক বিবাহ বলা হয়। এ ধরনের বিবাহ প্রেমঘটিত বা ভালবাসার বিবাহও বলে পরিচিত। প্রেম ঘটিত বিবাহ পিতামাতা বা অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষ নয়। এ ধরনের বিবাহে অভিভাবকের অনুমতি বা অনুমোদন আবশ্যক হিসেবে বিবেচিত নয়। অনেক সময় এ ধরনের বিবাহে পাত্র-পাত্রী সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকর্ম ছাড়াই রেজিস্ট্রীকরণের মাধ্যমে রোমান্টিক বিবাহ সম্পাদন করে থাকে। তবে কখনো কখনো পাত্র-পাত্রী নিজেরাই পছন্দ করে অভিভাবকগণ পরামর্শে অনেকক্ষেত্রে আবার আচার অনুষ্ঠান সুসম্পন্নের মাধ্যমে বিবাহ হয়ে থাকে।

৪.১ঃ৩ বিবাহের গুরুত্ব ঃ

মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আদিম মানুষের মধ্যে গোষ্ঠী জীবনের সূত্রপাত ঘটে। তখন থেকেই মানব সমাজে বিবাহ ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। বস্তুতঃ বিবাহ ব্যবস্থাগুলো মানব সমাজের অত্যন্ত প্রাচীন প্রথা। বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থা সভ্য সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং বিবাহের মাধ্যমেই পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের বৈধ

স্বীকৃতি লাভ করে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ বিবাহ ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে নিম্নে আলোকপাত করা হলো -

প্রথমত, পরিবারের ভিত্তিপ্রস্তর গঠনের ক্ষেত্রে ঃ স্বাভাবিক ও সুস্থ সমাজ জীবন সম্ভব করে তোলার জন্য বিবাহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিরোধ বিতর্কের উর্দ্ধে। কেবল বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত রীতি অনুসারে পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং পরিবার প্রতিষ্ঠা করাই হল বিবাহের সামাজিক উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। সুস্থ পারিবারিক প্রতিষ্ঠান হলো সমাজে ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণের সহায়ক। আবার এই পারিবারিক প্রতিষ্ঠানই বিবাহের উপর নির্ভরশীল ও বিবাহের মাধ্যমেই পারিবারিক জীবনের দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্বের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাকেজি (J.S. Mackenzic) "Outlineds of Social Philosophy" শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেছে "The supreme importance of the primary basis of the family gives a sufficient ground for attacking a certain sanetily and permanence to the institution of marriage."

দ্বিতীয়ত, বংশ রক্ষাকরণ ও শিশুদের লালন পালন ঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দম্পতি ও এদের সন্তান জন্মদান এবং লালন পালনের দায়িত্ব বর্তায়। শিশুর যথোপযুক্ত প্রতিপালন ও পরিচর্চার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এই দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ পিতামাতার উপরেই বর্তায়। যে কারণে শিশুর লালন পালন ও সামাজিকীকরণে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। বিবাহ পরিবারের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে এবং পারিবারিক বন্ধনকে স্থায়ী ও সুসংহত করে।

তৃতীয়ত, বিবাহ হলো যৌন সম্পর্কের সমাজস্বীকৃত ব্যবস্থা ঃ সুস্থ সমাজ জীবনের স্বার্থে নারী পুরুষের যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। যৌন আচরণ ও উচ্ছশৃংখলভাবে হলে তাতে সমাজে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। একমাত্র বিবাহ হলো মানব মানবীয় মিলনের সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত রীতি। প্রকৃতপক্ষে নারী ও পুরুষের যৌন সংযোগ সম্পর্কের সামাজিক উদ্দেশ্য হল সন্তান প্রজনন। বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্যকে সফল করে বিবাহ।

চতুর্থত ঃ সমাজের স্থায়ীত্ব ও সংহতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিবাহের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের মধ্যে বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন নতুন সামাজিক সম্পর্কের বন্ধন গড়ে উঠে। এই বন্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে মানব সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। বিবাহের মাধ্যমে বরপক্ষ ও কনেপক্ষ উভয় পক্ষের পরিবারের মধ্যে একটি আত্নীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং উভয় তরফের পরিবারের নিকট ও দুরসম্পর্কের জ্ঞাতি কুটুম্বদের মধ্যে আত্নীয়তার যোগসুত্র সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্ক ক্রমশঃ সমাজের মধ্যে সম্পর্কের জাল ছড়িয়ে দেয়।

পঞ্চমত, সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঃ বৈবাহিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে নরনারীর সামাজিক সম্পর্কসমূহ স্থিরীকৃত ও সমাজে নবজাতকের সঠিক স্থান ও সামাজিক ভূমিকা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সন্তান ও মাতৃত্বের স্বীকৃতি ও পিতৃত্বের স্বীকৃতি বা অনুমোদন বিবাহের মাধ্যমেই হয়ে থাকে এবং সন্তান এর সাথে পিতামাতার পারিবারিক সাহচর্য ও সহানুভূতি প্রেমপ্রীতি ভালবাসার সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক বৈধ জৈবিক কামনা চরিতার্থ হয় এবং নিবিড় আত্মিক ও আধ্যত্মিক চেতনার সৃষ্টি হয়।

ষষ্ঠত, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঃ বিবাহের ধর্মীয় তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইসলাম প্রতিটি ধর্মে বিবাহের উপর গুরুত্ব সকল বিতর্কের উর্দ্ধে। ইসলাম ধর্মে মানব সৃষ্টির রহস্যের মধ্যে বিবাহের গুরুত্ব নিহিত রয়েছে। তাছাড়া নারীদের নিরাপত্তা প্রদানে ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম।

সার-সংক্ষেপ

বিবাহ হলো নর ও নারীর মধ্যে সমাজস্বীকৃত এক ধরনের চুক্তি বরং উপায়। সময়ের বিবর্তনে বিবাহের ধরণ। প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান নিয়ম কানুন ভিন্নতা থাকায় বিবাহের ধরনের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। আবার বিভিন্ন আদিবাসী এবং গোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন ধরনের বিবাহের ব্যবস্থা রয়েছে। আধুনিক সমাজে বহুল প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থা হচ্ছে স্থিরীকৃত বিবাহ এবং রোমান্টিক বা পছন্দ অনুযায়ী বিবাহ। যে ধরনের বিবাহ প্রথা চালু থাকুক না কেন সমাজে (ক) পরিবারের গঠনের ক্ষেত্রে (খ) বংশরক্ষণ ও শিশুদের লালন পালন (গ) যৌন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ (ঘ) সমাজের স্থায়ীত্ব ও সংহতি রক্ষাকরণ (ঙ) সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারনের ক্ষেত্রে বিবাহের গুর□ত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

১. সত্য/মিথ্যা লিখুন

(ক) বিবাহ হচ্ছে নর ও নারীর মধ্যে এক ধরনের চুক্তি

(খ) প্রাথমিকভাবে বিবাহ দুইভাগে ভাগ করা হত তাহলো স্থিরীকৃত বিবাহ ও রোমান্টিক বিবাহ

(গ) বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব নেই।

উত্তরমালা - ক. সত্য খ. মিথ্যা গ. মিথ্যা।

২. সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর মোটামুটি -

১. অস্থায়ী বন্ধন ২. স্থায়ী সামাজিক বন্ধন ৩. স্বল্পকালীন চুক্তি ৪. সামাজিক বিধি

খ. প্রাথমিকভাবে বিবাহকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে -

১. ২ ভাগে ২. ৩ ভাগে ৩. ৪ ভাগে ৪. ৫ ভাগে

গ. একজন পুরুষ একই সঙ্গে একাধিক নারীর সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলে তাকে বলা হয় -

১. রোমান্টিক বিবাহ ২. বহু পতিত্ব বিবাহ ৩. বহু পত্নীত্ব ৪. বহু বিবাহ

উত্তরমালা -

পাঠ-৪.২ ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন

☞ ৪.২ঃ১ পরিবার বলতে কি বুঝায়

☞ ৪.২ঃ২ পরিবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ কি

☞ ৪.২ঃ৩ পরিবারের শ্রেণীবিভাগ/প্রকারভেদ

☞ ৪.২ঃ৪ পরিবারের কার্যাবলী/গুরুত্ব

ভূমিকা ঃ সমাজের মৌলিক ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। পরিবার সমাজ কাঠামোর মৌল অঙ্গ সংগঠন। এই পরিবার মানব সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই সমাজে বিদ্যমান। তাই এর সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে। পরিবারের সাথেই মানুষের আন্তরিক এবং অনেকটা অকৃত্রিম সামাজিক মিথস্ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। তাই পরিবার একটি সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

৪.২ঃ১ পরিবারের সংজ্ঞা

সাধারণভাবে আমরা পরিবার বলতে বুঝি বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক এবং তাদের অবিবাহিত সন্তানদের নিয়ে বাস করার একটি সংগঠনকে। মূলতঃ স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন দ্বারাই পরিবারের সৃষ্টি।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা ঃ বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিধ বিভিন্নভাবে পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তার ফলে পরিবারের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ববিধদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানীর সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করা হলো যাতে পরিবার সম্পর্কে সঠিক ও সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা হয়।

ম্যাকাইভার ও পেজ প্রদত্ত সংজ্ঞা ঃ অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং পেজ তাঁদের Society : In Introductory Analysis শীর্ষক গ্রন্থে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে "পরিবার হল এমন একটি গোষ্ঠী যার মধ্যে সুনির্দিষ্ট যৌন সম্পর্ক বর্তমান থাকে এবং সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের কাজে যা সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ীভাবে নিযুক্ত থাকে"।

জিসবার্টের সংজ্ঞা ঃ অধ্যাপক জিলবার্ট তাঁর Fundamental of Socilogy শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে এক অর্থে পরিবার হলো একটি একক। এ সদস্যরা একই আবাসে একত্রে বসবাস করে। এর মাধ্যমেই স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক একটি নিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে এবং এর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যে সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে পুরুষানুক্রম অনুসারে বৈবাহিক সম্পর্ক স্বীকৃত তা নির্ধারিত হয়।

অধ্যাপক অগবার্ণ ও নিমকফ এর সংজ্ঞা ঃ অধ্যাপক অগবার্ণ ও নিমকফ তাঁদের A Handbook of Socilogy শীর্ষক গ্রন্থে পরিবারের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক বলে মনে করা হয়। তাঁরা বলেছেন- "পরিবার হলো মোটামুটি স্থায়ীভাবে একত্রে বসবাসকারী স্বামী-স্ত্রী বা নরনারী। এদের সন্তান থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলে যৌন সম্পর্কযুক্ত নারী পুরুষ ও তাদের সন্তান সন্ততি হল পরিবারের প্রধান অঙ্গ।

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে, পরিবার হলো একটি সার্বজনীন স্থায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে স্বামী-স্ত্রী যৌন সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং রক্ত সম্পর্ক সম্পর্কিত সন্তান-সন্তানাদি সৃষ্টি হতে পারে আবার নাও হতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশ কাল ও সমাজ নির্বিশেষে এই পরিবার হল একটি সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই ।

৪.২ঃ২ পরিবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

পরিবারের বিভিন্ন সংজ্ঞা পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। পরিবারের বৈশিষ্ট্যসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করা যায় ঃ

১. **বিশ্বজনীনতা ঃ** মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে পরিবারের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। দেশ কাল নির্বিশেষে পরিবারের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। মানব সমাজের এই প্রাথমিক সংস্থাটি মানবসভ্যতার সকল স্তরেই ছিল বা আছে। মানুষ মাত্রই কোন না কোনভাবে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে বলা হয় যে, পরিবার হল মানুষের সঙ্গবদ্ধ জীবনের

এক বিশ্বজনীন রূপ। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন : "It is the most nearly university of all social forms. It is found in all societies at all stages of social development..... .

২. **আবেগপূর্ণ ভিত্তি ঃ** পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সকলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও গভীর অনুভূতিপূর্ণ। বৈজিবক প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন, সহবাস, সন্তান প্রজনন ও পিতা-মাতার স্নেহ-যত্ন ও মায়া-মমতা, প্রেমপ্রীতি ও আবেগ-অনুরাগ ইত্যাদির মানসিক বৃত্তির উপরই ভিত্তি করে পরিবার গড়ে উঠে ও টিকে থাকে।

৩. **গঠনমূলক প্রভাব ঃ** একজন ব্যক্তি জন্ম-লগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পারিবারিক পরিমন্ডলে বসবাস করে। তাই পরিবার তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুতঃ বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে প্রবেশের আগে মানুষের জীবনে পরিবারই হল সামাজিক পরিবেশ ও পরিবারের আঙ্গিকে ও মানসিক অভ্যাসে ব্যক্তি মানুষের চরিত্র গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সুতরাং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে গঠনের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকাই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৪. **সীমিত আকার ঃ** বৃহত্তর সামাজিক পরিমন্ডলের মধ্যে বহুবিধ সরস সংগঠন বর্তমান। সামাজিক সংগঠনসমূহের মধ্যে পরিবার ক্ষুদ্রতম প্রাথমিক গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচিত। স্বামী-স্ত্রী এই ২ জনকে নিয়ে পরিবার গঠিত হতে পারে এবং জৈবিক কারণেও এর আকার ক্ষুদ্র হতে বাধ্য। সুতরাং মানুষের সামাজিক কাঠামোতে পরিবারই হল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী।

৫. **সামাজিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় অংশ ঃ** অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মূল অংশ হিসাবে পরিবারের কথা বলা হয়। পরিবার যেমন সহজ সরল সমাজ ব্যবস্থার মূল অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়, তেমনি সমাজ সভ্যতার উচ্চতর জটিল পর্যায়েও সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র পরিবার। বস্তুতঃ অল্প বিস্তর কিছু সংখ্যক পরিবারের সমষ্টির ফলেই সূত্রপাত হয় সমষ্টিগত জীবনের বা সমাজ জীবনের।

৬. **সদস্যদের দায়িত্বশীলতা ঃ** প্রত্যেক সামাজিক সংগঠনের সদস্যরাই তাদের সংগঠনের প্রতি দায়িত্বশীল থাকে। কিন্তু পরিবারের ক্ষেত্রে এই দায়িত্বশীলতা অনেক বেশি যা সারা জীবন ধরে পালন করতে হয়। সুতরাং অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের তুলনায় সদস্যদের উপর পরিবারের দাবি অনেক বেশি এবং এই দাবি হল অবিচ্ছিন্ন বা একটানা।

৭. **সামাজিক অনুশাসন ঃ** পরিবার জীবন সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক বিধি-নিষেধ ও আইনের অনুশাসন উভয়েরই ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি পরিবারকে সামাজিক রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় আদর্শ, মূল্যবোধ, বিধি ব্যবস্থাকে মেনে চলতে হয়।

৮. **স্থায়ীত্ব ও অস্থায়ীত্ব ঃ** পরিবারকে যদি একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিচার করা তা হলে পরিবার হল একটি স্থায়ী ও শাশ্বত প্রতিষ্ঠান এবং পরিবার হল বিশ্বজনীন। কিন্তু পরিবারকে যদি একটি সংঘ (association) হিসাবে বিবেচনা করা হয় তাহলে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্থার তুলনায় পরিবার হল অত্যন্ত স্বল্প স্থায়ী ও সর্বাধিক পরিবর্তনশীল। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, যে সমস্ত ব্যক্তি নিয়ে পরিবার গঠিত হয় তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে পরিবারের অস্তিত্বের অবসান ঘটে।

৪.২ঃ৩ পরিবারের প্রকারভেদ (Types of Family) ঃ

সমাজের মৌলিক ও সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে পরিবারের বিভিন্ন ধরণ লক্ষ্য করা যায়। সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন নির্ণায়ক বা উপাদানের ভিত্তিতে পরিবারকে কয়েকটি ভাগ করেছেন -

১. ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মাত্রানুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস ঃ পরিবারে এই ধরণের প্রকারভেদ করা হয় পারিবারিক কর্তৃত্বের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে। অর্থাৎ বাবা-মার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মাত্রা অনুযায়ী পরিবার ২ প্রকারের। (ক) পিতৃশাসিত পরিবার (খ) মাতৃশাসিত পরিবার।

(ক) পিতৃ প্রধান পরিবার ঃ যে পরিবারের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান ও কর্তৃত্ব করার ভার পিতা বা স্বামীর হাতে ন্যস্ত থাকে তা হলে তাকে পিতৃ প্রধান পরিবার বলা হয়। পৃথিবীতে প্রায় সব সমাজেই এ পরিবার প্রচলিত।

(খ) মাতৃশাসিত বা মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ঃ যে পরিবারের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান এবং কর্তৃত্ব করার ভার স্ত্রী অথবা বয়স্ক মহিলাদের ওপর ন্যস্ত থাকে তাকে মাতৃপ্রধান পরিবার বলে। বাংলাদেশের গারো পরিবার মাতৃপ্রধান পরিবার।

২. বিবাহোত্তর বাসস্থান ঃ নব দম্পতির বিবাহ পরবর্তী বাসস্থানের ভিত্তিতে পরিবার চার প্রকার। যথা - (ক) পিতৃবাস, (খ) মাতৃবাস, (গ) নয়াবাস এবং (ঘ) মাতুলালয়।

(ক) পিতৃবাস পরিবার ঃ বিবাহের পর বিবাহিত দম্পতি স্বামীর পিতৃগৃহে বসবাসের মাধ্যমে যে পরিবার গঠন করে থাকে তাকে পিতৃবাস পরিবার বলে। আমাদের সমাজে পিতৃবাস পরিবার বেশি প্রচলিত।

(খ) মাতৃবাস পরিবার ঃ বিয়ের পর বিবাহিত দম্পতি স্ত্রীর মাতৃগৃহে বসবাসের মাধ্যমে যে পরিবার গঠন করে তাকে মাতৃবাস পরিবার বলে। গারো সমাজে মাতৃবাস পরিবার প্রচলিত।

(গ) নয়াবাস পরিবার ঃ বিবাহিত যে দম্পতি স্বামী-স্ত্রীর কারো পিতা বা মাতৃগৃহে বাস না করে স্বাতন্ত্র স্থানে বসবাসের মাধ্যমে যে পরিবার গঠন করে থাকে তাকে নয়াবাস পরিবার বলে। আমেরিকান সমাজে এ পরিবার প্রচলিত।

(ঘ) মাতুল বাস ঃ বিবাহিত দম্পতি স্ত্রীর বাবার বাড়ি বসবাসের মাধ্যমে যে পরিবার গঠন করে তাকে মাতুলাবাস পরিবার বলে।

৩. বংশানুক্রমের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ ঃ পরিবারকে বংশানুক্রমের ভিত্তিতে ২টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। (ক) মাতৃবংশানুক্রমিক পরিবার (খ) পিতৃবংশানুক্রমিক পরিবার।

(ক) মাতৃবংশানুক্রমিক পরিবার ঃ মাতৃকুলের পরিচয় যে পরিবারের সন্তানের পরিচয় নির্ধারিত হয় এবং সন্তান মাতৃকুলের বংশধর হিসেবে বিবেচিত হয়, সেই পরিবারকে বলা হয় মাতৃবংশানুক্রমিক পরিবার।

(খ) পিতৃবংশানুক্রমিক পরিবার ঃ পিতৃকুলের পরিচয় যে পরিবারের সন্তানের পরিচয় নির্ধারিত হয় এবং সন্তান পিতৃকুলের বংশধর হিসেবে বিবেচিত হয়, সেই পরিবারকে বলা হয় পিতৃবংশানুক্রমিক পরিবার।

৪. পরিবারের আকারের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাজন ঃ পরিবারের আকারের ভিত্তিতে পরিবার তিন প্রকার। যথা - (ক) অনু পরিবার (খ) যৌথ পরিবার এবং (গ) বর্ধিত পরিবার

(ক) অনু পরিবার ঃ স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তানদের নিয়ে যে পরিবার গঠিত হয় তাকে অনু পরিবার বলে। সাংগঠনিক দিক থেকে এই ধরনের পরিবার ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট।

(খ) যৌথ পরিবার ঃ আকার আয়তনের দিক থেকে একক পরিবারের তুলনায় যৌথ পরিবার বৃহদাকার অবশিষ্ট। বলা যায় যে, রক্তের সম্পর্কের যোগসুত্রের ভিত্তিতে কয়েকটি একক পরিবারের সমষ্টি হল যৌথ পরিবার। যে পরিবার স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তান সন্ততি এবং নাতী-নাতনীসহ বাস করে তাকে যৌথ পরিবার বলে।

(গ) বর্ধিত পরিবার ঃ যে পরিবারের তিন পুরুষ তথা বাবা মা, দাদা-দাদী, চাচা-চাচী, সন্তান সন্তনী সবাই মিলে বাস করে তাকে বর্ধিত পরিবার বলে।

৫. স্বামীর-স্ত্রীর সংখ্যার দিক থেকে শ্রেণীবিন্যাস ঃ স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবার চার প্রকারের। যথা ঃ -

(ক) এক বিবাহ ভিত্তিতে পরিবার ঃ একজন পুরুষ ও একজন মহিলার বিয়ের মাধ্যমে যে পরিবার গঠিত হয় তাকে একবিবাহ ভিত্তিক পরিবার বলে ।

(খ) বহু স্ত্রী বিবাহ ভিত্তিক পরিবার ঃ একজন পুরুষের সাথে একাধিক হিলার বিয়ের মাধ্যমে যে পরিবার গঠিত হায় তাকে বহু স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে।

(গ) বহু স্বামী বিবাহভিত্তিক পরিবার ঃ একজন মহিলার সাথে একাধিক পুরুষের বিয়ের ভিত্তিতে যে পরিবার গঠিত হয় তাকে বহু স্বামী বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে।

(ঘ) দলগত বিবাহ ভিত্তিক পরিবার ঃ একাধিক পুরুষের সাথে একাধিক মহিলার বিয়ের ভিত্তিতে যে পরিবার গঠিত হয় তাকে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে।

উপসংহারে বলা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সমাজ ও সংস্কৃতি ভেদে পরিবারের বিভিন্নরূপে লক্ষ্য করা যায়। তবে বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে একবিবাহ ভিত্তিক একক পিতৃতান্ত্রিক পরিবারই বেশি দেখা যায়। আগের যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গিয়ে অনু পরিবার বা নিউক্লিয়ার পরিবারই বেশি দেখা যাচ্ছে।

৪.২ঃ৪ পরিবারের কার্যাবলী (Function of the family)

মানব সমাজে পরিবারের ভূমিরার পরিধি বিশেষভাবে ব্যাপক এবং কার্যাবলী বহু ও বিভিন্ন। তবে পরিবার সমাজে কি কি কাজ সম্পাদান করে যে বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে ঐক্যমত্যের অভাব আছে। সমাজতত্ত্ববিদগণ পরিবারের কার্যাবলীকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

অধ্যাপক ডেভিস (Kingsley Davis) ঃ সমাজ জীবনে নানা পরিবার কর্তৃক সম্পাদিত মূল কার্যাবলীকে চার ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। পরিবারের কার্যাবলীর এই চারটি ভাগ হল ঃ সন্তান প্রজনন, সন্তান প্রতিপালন, কর্ম নিযুক্তির ব্যবস্থা এবং সামাজিকরণ।

সমাজবিজ্ঞানী মারডক ঃ মানব সমাজে পরিবারের চারটি প্রধান ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর ** শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। পরিবারের উল্লেখিত চার ধরনের ভূমিকা হল ঃ যৌথ, অর্থনৈতিক, প্রজনন ও শিক্ষা সম্পর্কিত। অধ্যাপক অগবার্ণ এবং নিমকফ পরিবারের দ্বারা সম্পাদিত কার্যাবলীকে ছয় ভাগে ভাগ করেছেন। পরিবারের কার্যাবলীর এই ছয়টি ভাগ হলোঃ স্নেহ সম্পর্কিত, অর্থনৈতিক প্রমোদমূল, নিরাপত্তামূলক, ধর্মীয় এবং শিক্ষা বিষয়ক।

অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং পেজ ঃ এর অভিমত অনুসারে সমাজে পরিবারগুলো মূলতঃ দু'ধরনের কার্যাবলীর মধ্যে কতকগুলো অপরিহার্য এবং কতকগুলো অপরিহার্য নয়। যৌন আকাঙ্কায় স্থায়ী পরিতৃপ্তি সাধন সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালন এবং একটি গৃহের ব্যবস্থা করা এগুলো হল পরিবারের অপরিহার্য কাজ। অপরদিকে দ্বিতীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত কাজগুলো হল- ধর্মীয় শিক্ষা বিষয়ক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ও বিনোদন বিষয়ক।

প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর সমাজজীবনে ও শক্তিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক সংস্থার কার্যাবলী ও ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সমাজে পরিবারে নিম্নলিখিত কার্যাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য -

১. **যৌন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি বা জৈবিক কার্যাবলী ঃ** পরিবার মানুষের যৌন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিবারের মধ্যেই মানুষের বৈধ জৈবিক তাড়নার পরিতৃপ্তি সাধিত হয়। নর-নারীর যৌন আকাঙ্খা পারিবারিক সংগঠনের মধ্যে বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ স্বীকৃত উপায়ে পরিতৃপ্তি লাভের সুযোগ পায়। মানুষের যৌন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনকেই অনেকে পরিবারের প্রথম প্রধান ও অপরিহার্য কাজ বলে উল্লেখ করেছেন।

২. **সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালন ঃ** মানব সমাজে সন্তান প্রজননের একমাত্র স্বীকৃত সংস্থা হয় পরিবার। বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবারের মধ্যে নর-নারীর যৌন মিলন ঘটে এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে নবজাতকের আবির্ভাব ঘটে। এভাবে পরিবার নিরবিচ্ছিন্নভাবে তার অস্তিত্ব বজায় থাকে এবং বংশের ধারা অব্যাহত রাখে।

৩. **অর্থনৈতিক কার্যাবলী ঃ** পরিবারের অর্থনৈতিক দায় দায়িত্বও অনস্বীকার্য। সদস্যদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ পরিপূরণ পরিবারই করে থাকে। সকল পরিবারই তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের বা সদস্যদের অনৈতিক চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সীমিত দায়িত্ব পালন করে। প্রাচীনকালে পরিবারগুলোই ছিল অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রাণকেন্দ্র এবং উৎপাদন ব্যবস্থার মুল একক। বর্তমানেও গ্রামাঞ্চলের বহু পরিবার কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকে এবং পারিবারিক পরিসরের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্রায়তন বা কুটির শিল্প গড়ে তোলে। শহরাঞ্চলে সমাজ পুরুষেরা বা নারীরা চাকুরিতে যোগ দেয়। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সমান সদস্যরা বিভিন্ন রকম কাজকর্মে নিযুক্ত থাকে।

৪. **দৈহিক ও মানসিক আকাংখার পরিতৃপ্তি ঃ** সদস্যদের শারিরীক ও মানসিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের স্বার্থে ব্যক্তি যতই নিজের শরীর ও মনের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে থাকে। পরিবার এই উভয় দিক থেকেই ব্যক্তি মানুষকে নিরাপত্তা প্রদান করে এবং ব্যক্তি পরিবারের মধ্যেই দৈহিক নিরাপত্তা ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। পরিবারের সদস্যগণ বিপদ-আপদ ও অসুখে-বিসুখে পারিবারিক সাহায্য সহযোগীতা করে থাকেন। শুধু দৈহিক নিরাপত্তা নয়, মানসিক নিরাপত্তা প্রদানের ব্যাপারে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে পরিবারের মধ্যেই স্নেহ-ভালবাসার প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ বর্তমান থাকে।

৫. **নিরাপত্তামূলক কার্যাবলী ঃ** পরিবারই শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। বর্তমানকালে পরিবারকে শিক্ষার কেন্দ্রস্থল বলা হয়। পরিবার প্রত্যেকটি শিশুর জন্যে সবচেয়ে উত্তম বিদ্যালয়। প্রত্যেকটি শিমু নিজ নিজ পরিবার থেকে পারস্পরিক আচার-আচরণ স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, নম্রতা, ভদ্রতা, দয়া-মায়া সামাজিকীকরণ ইত্যাদি গুণাবলী শিখে থাকে। সুনাগরিকের সকল গুণাবলী, সামাজিক আদর্শ, মূল্যবোধ, পরিবারেই উন্মেষ ঘটে। তাই পরিবারকে প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র বলে।

৬. **সাংস্কৃতিক সংরক্ষক ঃ** সমাজের সভ্যতা সংস্কৃতির অভিভাবক হিসাবেও পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের প্রচলিত জীবনধারার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার তার সদস্যদের প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। শিশু ও কিশোর সদস্যরা পরিবারের মাধ্যমে সমাজের প্রচলিত সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়। পারিবারিক পরিমন্ডলের মধ্যেই শিশু এমন এক শিক্ষা লাভ করে বা ক্ষমতা অর্জন করে যার দ্বারা সে সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনে সক্ষম হয়। পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা অনুজদের সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের উপযোগী করে তোলার ব্যাপারে নানাভাবে চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে Abraham Lincon বলেছিলেন যে, "Whatever I am and whatever I hope to be I owe to my family."

৭. **ধর্মীয় কার্যাবলী ঃ** ধর্মীয় বিষয়েও পরিবারের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিবারই সন্তানদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে থাকে। ধর্মীয় শিক্ষাচার, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, নিয়ম-শৃংখলা নীতিবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিবারই শিক্ষা দিয়ে থাকে। পরিবারের ধর্মীয় কর্মকান্ডের ফলে নিজের মনে ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে।

৮. **রাজনৈতিক কার্যাবলী ঃ** পরিবার হলো রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম একক। পরিবার প্রধান রাষ্ট্রের প্রধানের ন্যায় পরিবার পরিচালনা করেন। পরিবারের সকল সদস্য তার আদেশ পালন করে ও তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। রাজনীতির মূল বিষয় আদেশ ও আনুগত্যের অনুশীলন পরিবারে সু-সম্পন্ন হয়। পরিবার থেকে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা, রাজনৈতিক সচেতনতা, নাগরিকের দায়িত্ববোধ কর্তব্যবোধ, আইন শৃংখলা ইত্যাদি বিষয় শিখে থাকে।

৯. **সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ঃ** সম্পত্তি সংরক্ষণ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রেও পরিবারের ভূমিকা অনন্য। পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা সকল সমাজব্যবস্থায় বর্তমানে দেখা যায়। বিষয় সম্পত্তিও জমিজমা, টাকাকড়ি প্রভৃতি পারিবারিক সম্পত্তি উত্তারধিকার সূত্রে এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষের কাছে হস্তান্তরিত হয়। সম্পত্তি সংরক্ষণ ও উত্তরাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১০. **সামাজিক মর্যাদা প্রদান ঃ** সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে সামাজিক মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রেও পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বৃহত্তর সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা প্রতিপন্ন হয় পারিবারিক পরিচিতির পরিপ্রেক্ষিতে। সুতরাং সামাজিক ক্ষেত্রে পারিবারিক পরিচিতি ব্যক্তির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ পারিবারিক পরিচিতির সূত্রেই ব্যক্তি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই পরিচিতি ব্যক্তি জন্মসূত্রেই পেয়ে থাকে। প্রতিটি পরিবার তার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের প্রয়োজনীয় মর্যাদা প্রদান করে।

সাম্প্রতিককালে পরিবারের চিরচারিত দায়দায়িত্ব এবং তার গুরুত্ব সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। সমাজ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক সংস্থানসমূহ পরিবারের বিভিন্ন কাজকর্ম যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব সহকারে সম্পাদন করছে। এতদসত্বেও অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা এখনও তাৎপর্যপূর্ণ ও অত্যন্ত উজ্জ্বল। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে সন্তান প্রজনন, সন্তান প্রতিপালন, সামাজিকীকরণ প্রভৃতি কার্যাবলীর কথা বলা যায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকাকে এখনও উপেক্ষা করা যায় না।

সার-সংক্ষেপ

সমাজের মৌলিক ও সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে পরিবার। সকল সমাজে সকল কালে পরিবার হচ্ছে সমাজের সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান। পরিবারের সংজ্ঞা নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদদের দ্বিমত থাকলেও সাধারণত পরিবার বলতে বিবাহের মাধ্যমে একজন নর ও নারী আবদ্ধ হয়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপন, সন্তান উৎপাদন ও লালন পালন সম্পর্কিত সংগঠনকে বুঝে থাকি। সাধারণত পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে বিশ্বজনীনতা আবেগপূর্ণতা সদস্যদের দায়িত্বশীলতা, স্থায়ীত্ব। পরিবারের কর্তৃত্বানুযায়ী পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার, বংশানুক্রমিক অনুযায়ী ঃ মাতৃবংশানুক্রমিক পরিবার ও পিতৃবংশানুক্রমিক পরিবার এবং পরিবারের আকার অনুযায়ী ও আধুনিককালে অনুপরিবার, যৌথ পরিবার ও বর্ধিত পরিবার শ্রেণী ভাগ করা হয়ে থাকে। মূলতঃ পরিবার যে সব কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে তা হচ্ছে জৈবিক কার্যাবলী, সন্তান জন্মদান ও লালন পালন, অর্থনৈতিক, দৈহিক ও মানসিক পরিতৃপ্তি, নিরাপত্তামূলক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কার্যাবলী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) লিখুন

(১) পরিবার হচ্ছে -

(ক) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (খ) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান

(গ) সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান (ঘ) শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠান।

(২) আধুনিক কালে পরিবারকে -

(ক) ২ ভাগে বিভক্ত করা যায় (খ) ৬ ভাগে ভাগ করা যায়

(গ) ৩ ভাগে ভাগ করা যায় (ঘ) ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

(৩) পরিবারের কার্যাবলী মূলত ঃ-

(ক) যৌন সম্পর্ক ও সন্তান জন্মদান, অর্থনৈতিক সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে

(খ) আইল শৃংখলা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে

(গ) আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করে থাকে

(ঘ) পরিবেশের উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও উন্নয়ন করে থাকে।

উত্তরমালা ঃ

১. (গ) সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ২. (ক) ২ ভাগে বিভক্ত করা যায়

৩. (ক) যৌন সম্পর্ক ও সন্তান জন্মদান, অর্থনৈতিক সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

পাঠ-৪.৩ ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জ্ঞাতিসম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এ পাঠশেষে আপনি বর্ণনা করতে পারবেন -

- ☞ ৪.৩ঃ১ জ্ঞাতি সম্পর্ক বলতে কি বোঝায়
- ☞ ৪.৩ঃ২ জ্ঞাতি সম্পর্কের ধরণ ও শ্রেণীবিভাগ
- ☞ ৪.৩ঃ৩ জ্ঞাতি সম্পর্কের গুর□ত্ব/*ভূমিকা*

ভূমিকা ঃ আদি মানব সমাজ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্যে যে কয়টি প্রতিপাদ্য বিষয় নৃ-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে জ্ঞাতিসম্পর্ক তার মধ্যে অন্যতম। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ তার আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য পরিবারের ছত্রছায়ায় সমাজে বাস করে। আর এই সমাজ গঠিত হয় জ্ঞাতি সম্পর্কের ভিত্তিতে। অর্থাৎ "Kinship is the core of social Organization".

৪.৩ঃ১ জ্ঞাতি সম্পর্কের সংজ্ঞা বলতে কি বুঝায়?

ইংরেজি Kin এর আভিধানিক অর্থ গোষ্ঠী, কুটুম্ব, জ্ঞাতি। এই Kin থেকেই Kinship এর উৎপত্তি। আর Kinship শব্দের অর্থ জ্ঞাতিসম্পর্ক, রক্তসম্পর্ক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক। রক্তের মাধ্যমে এবং বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাই হলো জ্ঞাতি সম্পর্ক।

--- রবার্টসন তাঁর Sociology গ্রন্থে বলেন, "জ্ঞাতিসম্পর্ক হচ্ছে ঐসব ব্যক্তির মধ্যকার এক সম্পর্কের জাল বিশেষ যাহার সাধারণ পূর্বপুরুষের উত্তরসূরী হিসেবে দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে অথবা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ"।

-- আবার নৃ-বিজ্ঞানী রিভার্স এর মতে "ব্যাপক অর্থে জ্ঞাতিসম্পর্ক বলতে রক্ত, বিবাহ, কল্পনা, বন্ধুত্ব, দত্তক গ্রহণ ইত্যাদি বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্ককে বুঝায়"। মোট কথা মানুষের সাথে মানুষের জন্ম বা বংশগত বন্ধন, কাল্পনিক অথবা পাতানো আত্মীয়তার বন্ধনকে জ্ঞাতিসম্পর্ক বলা হয়।

৪.৩ঃ২ জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরণ ও শ্রেণীবিভাগ

জ্ঞাতিসম্পর্ক সমাজ সংগঠনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধনই সমাজের বিভিন্ন মানুষকে সংগঠিত করে, সৃষ্টি করে মানব সম্পর্কের জটিল জাল। রক্ত ও বৈবাহিক বন্ধন সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও আরো কয়েক ধরণের বন্ধন রয়েছে। তাই জ্ঞাতিসম্পর্ককে চার ধরণের ভাগ করা যায়।

১. **রক্ত সম্পর্কিত বন্ধন বা জৈবিক ঃ** জন্মগতভাবে রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে যে জ্ঞাতিসম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাকে রক্ত সম্পর্কিত বন্ধন বলা হয়। যেমন- একজন ব্যক্তি তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতনীর সাথে রক্ত সম্পর্কিত সম্পর্কযুক্ত।

২. **বৈবাহিক বন্ধন ঃ** রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়, বরং বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যে জ্ঞাতিসম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তাকে বৈবাহিক বন্ধনে সম্পর্কিত জ্ঞাতিসম্পর্ক বলা হয়। কোন মহিলা বা পুরুষ তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এবং শ্বশুর-শ্বাশুড়ী পক্ষের জ্ঞাতিদের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে সম্পর্কযুক্ত। বস্তুতঃ কোন স্বামীর কাছে স্ত্রী প্রায় ক্ষেত্রেই বৈবাহিক বন্ধনের জ্ঞাতি।

৩. **কাল্পনিক বন্ধন ঃ** রক্ত কিংবা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ নয়, অথচ তাদের সাথে রক্ত ও বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ আত্মীয়দের মতই আচরণ করা হয় এ রকম কাল্পনিকভাবে যে জ্ঞাতি সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাকে কাল্পনিক জ্ঞাতিসম্পর্ক বলা হয়। মূলতঃ জ্ঞাতি পদ দ্বারা সম্বোধিত অনাত্মীয় ব্যক্তিদের সাথে যে সম্পর্ক তাই হলো কাল্পনিক জ্ঞাতিসম্পর্ক।

৪. **প্রথাগত বন্ধন ঃ** রক্ত বা বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত অনেকটা স্থানীয় প্রথাগত সূত্রে কাউকে আত্মীয় করে নেয়ার রেওয়াজই হলো প্রথাগত জ্ঞাতিসম্পর্ক। যেমন- সামাজিক রীতি অনুযায়ী মায়ের সমপর্যায়ের মহিলাদের খালা এবং বাবার সমপর্যায়ের লোকদের চাচা সম্বোধন করা হয়। নৃ-বিজ্ঞানী মর্গান জ্ঞাতিসম্পর্ককে দুইভাগে ভাগ করেছেন।

(ক) শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক ঃ এ প্রকারের জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ক সুনির্দিষ্টভাবে বা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায় না। এক্ষেত্রে আত্মীয়তার দূরত্বানুযায়ী আত্মীয়দেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং একটি শ্রেণীর আত্মীয়দেরকে একই শব্দে সম্বোধন করা হয়। এ জন্য এটাকে শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ককে বাবার স্তরে যেমন, চাচা, মামা, খালু, ফুপা এদের স্তরে সবাইকে বাবা ডাকা হয়। আবার মায়ের স্তরে মা, চাচী, মামী, ফুফু এদেরকে মা নামে সম্বোধন করা হয়।

(খ) বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক ঃ এ প্রকারের জ্ঞাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ককে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায়। এ পদ্ধতিতে এক বা একাধিক সম্বোধক শব্দ প্রয়োগ করে সম্বোধন করা হয়। এক্ষেত্রে পিতামাতা, চাচা-চাচী, মামা-মামী, দাদা-দাদী প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা শব্দ প্রয়োগ করা হয়। নিম্নে এদের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরা হলো -

ক্রমিক	শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক
১.	সমাজবিকাশের প্রথম পর্যায়ে শ্রেণীমূলক জ্ঞাতি সম্পর্কের প্রচলন বেশি দেখা যায়।	একক বিবাহভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থা থেকে বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক চালু হয়
২.	শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্কে কোন ব্যক্তির আপন ভাই ও পিতৃব্য পুত্রদের সবাইকে ভাই, মায়ের বোনের মেয়েকে বোন বলে সম্বোধন করা হয়।	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্কে কোন পরিচয় বিনিময়ের সময় স্পষ্টভাবে আত্মীয়তা উল্লেখ করা হয়। যেমন - সে আমার চাচাত ভাই বা মামাত ভাই এর মধ্যে বর্ণনামূলক স্তর আছে।
৩.	শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায় না।	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায়।
৪.	শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক প্রাক-একক বিবাহ পরিবার পর্যায়ের বেলায় প্রযোজ্য।	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক প্রাক একক বিবাহ প্রথার উদ্ভবের সাথে সাথে এর ব্যবহার শুরু হয়।
৫.	শ্রেণীমূলক আত্মীয়তা মালায়ন ও তুরানিয়ান সমাজে বেশী লক্ষ্য করা যায়।	মর্গানের মতে, বর্ণনামূলক আত্মীয়তা অর্থ, সেমেটিক প্রভৃতি সমাজে বেশী লক্ষ্য করা যায়।
৬.	শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং সম্পত্তির যৌথ মালিকানা একই সঙ্গে বর্তমান।	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক ও ব্যক্তিগত মালিকানা পরবর্তী সময়ে একই সঙ্গে শুরু হয়।
৭.	শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্কের একটি শব্দ একই শ্রেণীর সকল আত্মীয়তাকে বুঝাতে পারে।	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্কের একই শ্রেণীর কতকগুলো শব্দের সমন্বয়ে একজন আত্মীয়কে চিহ্নিত করা যায়।
৮.	শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্কের একটি কাজ একই ধারায় দন্ডায়মান।	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক ভিন্ন ধারায় দন্ডায়মান।
৯.	শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক সূচক শব্দগুলো সৃষ্টি হয় মনস্তাত্ত্বিক কারণে।	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক সূচক শব্দগুলো সামাজিক কারণে সৃষ্টি হয়েছে।
১০.	শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রথার ভিত্তি হল দলগত বিষয়।	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক প্রথার ভিত্তির ওপর কম নির্ভরশীল।

৪.৩ঃ৩ জ্ঞাতি সম্পর্কের গুরুত্ব

জ্ঞাতিসম্পর্ক হচ্ছে সমাজ কাঠামোর মূল চাবিকাঠি। নৃ-বিজ্ঞানে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে রবিন ফক্স বলেন - "দর্শন শাস্ত্রের কাছে যুক্তিবিদ্যার যেমন গুরুত্ব এবং শিল্পকলার কাছে অনাবৃত দেহের ছবির যেমন প্রয়োজনীয়তা তেমনি নৃ-বিজ্ঞানের কাছে জ্ঞাতিসম্পর্কের সেই গুরুত্ব"। নিম্নে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো -

১. **সমাজ কাঠামোর ক্ষেত্রে ঃ** জ্ঞাতিসম্পর্ক সমাজ কাঠামোর মূলে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক কাজ করে। আর এই পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হলো জ্ঞাতিসম্পর্ক। সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও মৌল সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিবারকে জানতে হলে জ্ঞাতিসম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে হবে।

২. **বৈবাহিক ক্ষেত্রে ঃ** বৈবাহিক ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। আদিম সমাজে দেখা যেত যে, এলাকায় বেশী শিকার পাওয়া যায়, বেশী সুবিধা পাওয়া যায় সে এলাকার গোত্রের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। আধুনিক সমাজেরও দেখা যায় আর্থিক ও ক্ষমতার প্রতিপত্তি লাভের জন্য বিশেষ গোষ্ঠীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়।

৩. **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঃ** জ্ঞাতিরা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পরস্পরকে সাহায্য করে। একই জ্ঞাতির সদস্যরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। সম্পত্তির ভাগ বন্টনের ক্ষেত্রে জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা অনন্য।

৪. **সামাজিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ঃ** সামাজিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক সমাজে দেখা যায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. **জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে ঃ** আধুনিককালের জাতীয়তাবোধ বস্তুত তথাকথিত 'আদিম' সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্কবোধেরই সম্প্রসারিত রূপ। আজকের যুগে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জ্ঞাতি নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

৬. **চাকরির ক্ষেত্রে ঃ** আধুনিক আমলাতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় চাকরির ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। বড় বড় অফিস ও মিল কারখানায় জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সদস্যরই বেশী চাকরি পাচ্ছে।

৭. **সামাজিক সংহতির ক্ষেত্রে ঃ** সামাজিক সংহতি সৃষ্টিতে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে জ্ঞাতিরা একত্রিত হয়। মানুষের মৌল চাহিদা পূরণ, শিশুর লালন পালন, সামাজিকীকরণ এবং মানুষের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা যেমন- স্নেহমমতা, ভালবাসা, সাহচর্য ইত্যাদি পূরণের ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্ক মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। জ্ঞাতিসম্পর্কই মানুষের মধ্যে সহমর্মিতাবোধ ও একাত্মবোধ সৃষ্টি করে, সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। বিয়ে, মৃত্যু, বিপদে-আপদে, জরুরী অবস্থায় জ্ঞাতিরাই প্রথমে এগিয়ে আসে। আদিম সমাজে জ্ঞাতিদের সাহায্য সহযোগিতাই সমাজকল্যাণের জন্ম দিয়েছে।

সার-সংক্ষেপ

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্ক হচ্ছে অন্যতম যা নৃ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে সমৃদ্ধ করেছে এবং জ্ঞাতি সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজ গঠিত হয়ে থকে। এককথায় জ্ঞাতি সম্পর্ক বলতে বুঝায় বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে রক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাই হচ্ছে জ্ঞাতিসম্পর্ক। নানা ধরনের জ্ঞাতি সম্পর্ক সমাজে প্রচলন রয়েছে তাহচ্ছে - (ক) বৈবাহিক সম্পর্কে জ্ঞাতিসম্পর্ক (খ) রক্তের সম্পর্কে জ্ঞাতি সম্পর্ক (গ) কাল্পনিক জ্ঞাতিসম্পর্ক (ঘ) প্রথাগত জ্ঞাতিসম্পর্ক (ঙ) শ্রেণীমূলক জ্ঞাতি সম্পর্ক (চ) বর্ণনামূলক জ্ঞাতি সম্পর্ক। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞাতি সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষ করে পরিবার সৃষ্টির ক্ষেত্রে, সামাজিক কাঠামো সৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্পত্তির বণ্টনের ক্ষেত্রে, এবং জাতীয়তাবোধ ও নেতৃত্বের সৃষ্টির ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্ক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সত্য/মিথ্যা লিখুন

১. রক্তের মাধ্যমে ও বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে তাকে জ্ঞাতি সম্পর্ক বলে।

২. বর্ণনামূলক জ্ঞাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায়।

৩. সামাজিক সংহতি ও সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে জ্ঞাতি সম্পর্ক কোন ভূমিকা পালন করে না।

উত্তরমালা - ১. সত্য ২. সত্য ৩. মিথ্যা ৪.

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. ইংরেজি Kin এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে -

ক. প্রথা খ. জ্ঞাতি গ. প্রতিবেশী ঘ. বন্ধুত্ব

২. জ্ঞাতি সম্পর্ককে কয় ভাগে ভাগ করা যায় -

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

উত্তরমালা - ১. খ. জ্ঞাতি, ২. গ. ৪।

পাঠ-৪.৪ ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনসমষ্টি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে বলতে পারবেন -

- ☞ ৪.৪ঃ১ জনসমষ্টি বলতে কি বুঝায়?
- ☞ ৪.৪ঃ২ জনসমষ্টির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
- ☞ ৪.৪ঃ৩ গ্রামীণ জনসমষ্টি বলতে কি বুঝায়?
- ☞ ৪.৪ঃ৪ গ্রামীণ জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য
- ☞ ৪.৪ঃ৫ শহরে জনসমষ্টি বলতে কি বুঝায়? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ☞ ৪.৪ঃ৬ গ্রামীণ ও শহরে জনসমষ্টির মধ্যে পার্থক্য

৪.৪ঃ১ জনসমষ্টি বলতে কি বুঝায়?

সাধারণ অর্থে Community শব্দের অর্থ সম্প্রদায় কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে এর পরিভাষা জনসমষ্টি। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। দলবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য নিজস্ব জীবনধারা-রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আচার-ব্যবহার ঐতিহ্য, নিজস্ব স্বার্থ ও আদর্শ গড়ে তোলে। এভাবে একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের সাথে অন্য ভৌগোলিক অঞ্চলের পার্থক্য সূচিত হয়।

সুতরাং জনসমষ্টি বলতে মোটামুটিভাবে একই ধরনের জীবনযাত্রা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী, যারা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করে। অর্থাৎ জনসমষ্টি হলো এমন এক জনগোষ্ঠী যারা নির্দিষ্ট এলাকায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতিবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিবেশীসুলভ মন নিয়ে বসবাস করে। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার তাঁর "Society : Ifs Structure and Change" নামক গ্রন্থে জনসমষ্টির যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন তা হল, জনসমষ্টি বলতে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের বাসস্থান, স্বার্থ ও জীবন যাত্রার ধারা এক ও অভিন্ন। কিংসলে ডেভিস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীকে জনসমষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছেন। অধ্যাপক জি ডি এইচ কোল বলেছেন, "এরূপ একটি গোষ্ঠী নিয়ে জনসমষ্টি গঠিত হয়, যারা একই রীতিনীতি একই ধরনের আচার ব্যবহার, একই ঐতিহ্য, একই সামাজিক আদর্শ ও স্বার্থে উদ্বুদ্ধ এবং একই সামাজিক সম্পর্কে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একত্রে বসবাস করে।

জনসমষ্টি বলতে আমরা বুঝি কোনো ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী জনসাধারণ পারস্পরিক স্বার্থের দিক দিয়ে যাদের যথেষ্ট মিল আছে, জীবন যাত্রার আচার ও আচরণ রীতি-নীতি প্রথা বিভিন্ন দিক দিয়ে যাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান এবং যারা এমন কতকগুলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অধিকারী যেগুলো তাদেরকে তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে তারা যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে।

৪.৪ঃ২ জনসমষ্টির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

জনসমষ্টিগুলো কখন কিভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে মানুষ যখল দলবদ্ধভাবে এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে তখন থেকে জনসমষ্টি উদ্ভব হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ, জীবন-যাত্রার প্রয়োজনীয় উপকরণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক পদ্ধতি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরণের মানব সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটেছে।

শিকার ও খাদ্য সংগ্রাহক জনসমষ্টি ঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ ধরনের জনসমষ্টি বিদ্যমান ছিল। সে সময় মানুষ অত্যন্ত সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতো। তারা পশু শিকার করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতো। যেখানে তারা খাদ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হতো সেখানেই বসবাস করতো। এক কথায় তারা যাযাবর ছিল। তবে মৎস্য শিকারিরা সাধারণত কিছুদিন এক জায়গায় দলবদ্ধ হয়ে বাস করতো। সে যুগে মানব সমষ্টি সেখানে খাদ্যের সন্ধান পেতো বা শিকার করার জন্য পশু-পাখির সন্ধান পেতো সেখানেই বসবাস করতো। যখন খাদ্যের অভাব দেখা দিত তখন খাদ্যাভাবে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটতো। তাদের কৃষি ছিল গ্রামীণ। বৃদ্ধলোকের বাড়িঘরের চতুর্দিকে যুবকদের বাড়ি ঘর থাকতো কারণ বন্য পশুদের আক্রমণ থেকে স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল যুবকদের। সম্প্রদায়ের/জনসমষ্টির লোকদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ এবং সে সম্পর্কের ভিত্তি ছিল পারস্পরিক সমঝোতা।

মেষ পালক জনসমষ্টি ঃ জনসমষ্টি এ পর্যায়ে মানব জনসমষ্টি পশুপালন শুরু করে এবং বিভিন্ন প্রকারের পশু পুষতে ও তাদের যত্ন করতে শিখে।

কৃষিভিত্তিক জনসমষ্টি ঃ অনেকের মতে এ ধরনের জনসমষ্টি গড়ে উঠে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে। সর্বপ্রথম মিশরের নীলনদের অববাহিকায় কৃষিকাজ শুরু হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানব জনসমষ্টি বৃক্ষরোপন ও অন্যান্য ধরনের কৃষিকাজ শুরু করে। মিসরের পর জার্মানী, ইটালী, ফ্রান্সসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃষিভিত্তিক জনসমষ্টি গড়ে উঠে। গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক জনসমষ্টির বিকাশকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় ।

(ক) **আদিম জনসমষ্টি ঃ** আদিম গ্রামীণ জনসম্প্রদায় ছিল ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট। দশ-বিশটি পরিবার নিয়ে গড়ে উঠতে এই রকম এক একটি ক্ষুদ্রাকৃতির গ্রামীণ জনসম্প্রদায়। ক্ষুদ্রাকৃতির আদিম গ্রামীণ জনসমষ্টি সদস্যদের মধ্যে ছিল ব্যাপক আত্মীয়তার বাহন ও ভূ-সম্পত্তির সাথে গভীর সংযোগ এই ২টি বিষয় তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি করত এক গভীর সমষ্টি বোধ। এ ক্ষেত্রে জমিজমা সকলেই চাষাবাদ করত এবং সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। নিজেদের মধ্যে বিবাহ যৌন সম্পর্ক সন্তান প্রজনন ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হতো। পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা চালু ছিল।

(খ) **মধ্যযুগীয় জনসমষ্টি ঃ** মধ্যযুগে গ্রামীণ জনসমষ্টি আকৃতি ও প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এ পর্বে জনসমষ্টির সদস্যদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসে এবং ভূ-সম্পত্তির উপর জনসমষ্টি সকল সদস্যদের সাধারণ মালিকানার অবসান ঘটে।

মধ্যযুগে সৃষ্টি হয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার। জমিজমার মালিকানা বনে যায় মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে। এই সময়ে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে একটি নতুন "ভূ-স্বামী" শ্রেণীর। অনুরূপভাবে 'ভূমিদাস' নামে আর একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। কৃষকেরা পরিণত হয়েছে ভূমিদাসে। তবে গ্রামীণ জনসমষ্টির সদস্যদের মধ্যে কতগুলি বিষয় সংহতি সংরক্ষণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক হলো পেশাগত ঐক্য সাধারণ আনুগত্য ভূমিদাসত্বগিরি ইত্যাদি।

(গ) **আধুনিক গ্রামীণ জমসমষ্টি ঃ** আধুনিক গ্রামীণ জনসমষ্টি আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় - (১) দলবদ্ধ বা একত্রিত জনসমষ্টি এবং (২) পৃথক পৃথক বা বিচ্ছিন্ন জনসমষ্টি। এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার গ্রামগুলো একত্রিত বা দলবদ্ধ ধরণের অর্থাৎ এসব দেশের গ্রামের লোকজন একত্রে এক জায়গায় বসবাস করে। এদের বাসস্থান থেকে চাষের ভূমি একটু দূরে থাকে। কারণ কৃষকেরা সবাই একই গোত্রের; তাই গোত্রের প্রধান চায় যে, সবাই এক জায়গায় পাশাপাশি বাস করুক। তাছাড়া এভাবে বসবাস করায় তারা একে অপরের কৃষিকাজে সাহায্য করতে পারে। কোনো কোনো দেশের লোকেরা আবার বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতে পছন্দ করে। তারা আলাদা আলাদাভাবে বসবাস করে, কারণ তাদের একজন অন্যজনের সঙ্গে পরিচিত নয় এবং তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে।

(ঘ) **শহুরে জনসমষ্টি ঃ** প্রাচীনকালেও শহরে জনসমষ্টি বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সামাজিক জীবন ছিল নগরকেন্দ্রিক। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প-বিপ্লবের ফলে সারা পৃথিবীতে উৎপাদন ব্যবস্থা ও শিল্পে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। ফলশ্রুতিতে গ্রামীণ জনসমষ্টির তাদের গুরুত্ব থেকে ক্রমশঃ বিচ্যুত হচ্ছে। নগরায়নের ফলে গ্রামের জনগোষ্ঠী ক্রমশঃ নগরসভ্যতার দিকে চলে আসছে।

বর্তমানে জনসমষ্টি ২টি ভাগে বিভক্ত। একটি হলো গ্রামীণ জনসমষ্টি অন্যটি শহরে জনসমষ্টি। বহুযুগ ধরেই মানুষ গ্রাম অথবা শহবে বসবাস করে। সুতরাং গ্রাম এবং শহর দুটি বহু পরিচিত জনপদ। সকল দেশেই মোট জনসংখ্যার একটি অংশ বসবাস করে শহরে। সুতরাং বসবাসের অঞ্চলগত বিচারে প্রত্যক দেশের মোট অধিবাসীকে পরিস্কারভাবে উপরোক্ত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়।

৪.৪ঃ৩ গ্রামীণ জনসমষ্টি বলতে কি বোঝায় ?

গ্রামীণ জনসমষ্টির সংজ্ঞা ঃ গ্রাম জনসমষ্টি দু'টি প্রত্যয়ের সমষ্টি গ্রাম ও সমষ্টি। ব্যাডেন পাওয়েল তার "Orgine and Growth of Indian village Communities" গ্রন্থে বলেন, - "চারদিকে চাষযোগ্য জমি পরিবেষ্টিত কয়েক গুচ্ছ ঘর-বাড়ি মিলে গঠিত হয়, গ্রাম যার রয়েছে একটি নাম ও সীমানা। গ্রাম বলতে চারপাশের ঐ জমা-জমিসহ কয়েক গুচ্ছ ঘর বাড়িকে বুঝায়।

আর জনসমষ্টি হল একটি জনগোষ্ঠী যারা নির্দিষ্ট এলাকায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতিবোধ উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিবেশীসুলভ মন নিয়ে বসবাস করে। অতএব গ্রামীণ জনসমষ্টি বলতে আমরা বুঝি গ্রামে বসবাস করা এমন একটি জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে সম্প্রদায়গত মন-মানসিকতা রয়েছে। রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতা সংহতি ও প্রতিবেশীমূলক মন রয়েছে ঐ গ্রামীণ পরিসরে এলাকাভিত্তিক ক্রমশঃ এক চেতনা, যে চেতনায় তারা মনে করে যে, তারা একই গ্রামের অধিবাসী।

সমাজবিজ্ঞানী সেন্ডারস - এর মতে, "গ্রামীণ জনসমষ্টি বলতে বুঝায় একই ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী জনগণ ও তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা নির্বাচিত এক ধরনের জনপদ সংঘ। যে বিশেষ এলাকায় জনগণ একত্র বসবাস করে সে এলাকা নিয়ে একটি গ্রাম গঠিত হয় যা জনসমষ্টি দৈনন্দিন কার্যাবলী একটি কেন্দ্রস্থল বলে পরিগণিত হয়।

৪.৪ঃ৪ গ্রামীণ জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য

গ্রামীণ জনসমষ্টির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল -

১. **কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ঃ** কৃষিকে কেন্দ্র করে এর অর্থনৈতিক কার্যক্রম মূলতঃ কৃষিকে কেন্দ্র করেই গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আবর্তিত হয়ে থাকে। গ্রামীণ জনগণ হল প্রধানত কৃষিজীবি। গ্রামবাসীদের পেশা ও জীবিকার মূখ্য উৎস হল কৃষি। গ্রামবাসীদের অন্যান্য আনুষাঙ্গিক রুজি রোজগারের উপায় উৎস থাকলেও সেগুলি মূলতঃ কৃষির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ প্রসঙ্গে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন - গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতি হল কৃষিভিত্তিক। গ্রামীণ জনসম্প্রদায়ের অন্যান্য দিক ও বিষয়াদি কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে।

২. **জনসম্প্রদায় গত চেতনা ঃ** গ্রামীণ জনসম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে এক সমষ্টিগত চেতনার সদস্যদের মধ্যে গভীর এক ঐক্যবোধ বর্তমান থাকে। গ্রামের উৎসব-অনুষ্ঠান বা পালা-পার্বণে সাধারণতঃ সকলে সমবেতভাবে অংশ গ্রহণ করে। তাদের সামাজিক রীতি নীতি আচার বিচার প্রথা প্রকরণ প্রভৃতি অভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। তারা প্রত্যেককে চিনে ও জানে। এসব কারণের জন্য এক গভীর সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়।

৩. **যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ঃ** গ্রামীণ জনসম্প্রদায়ের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যৌথ পরিবার ব্যবস্থা। একান্নবর্তী যৌথ পরিবার ব্যবস্থার অস্তিত্ব গ্রামাঞ্চলে এখন কম-বেশী বর্তমান। এর একটি বড় কারণ হল গ্রামাঞ্চলের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। কৃষিকে কেন্দ্র করে স্ত্রী-পুরুষ সন্তান সন্তানাদি বাবা-মা, দাদা-দাদী, চাচা-চাচী সবিশেষ পরিবারে সকলে যে যার সাধ্যমত এই কাজ কর্মে অংশগ্রহণ করে থাকে ফলশ্রুতিতে তারা একই পরিবারে বসবাস করে।

৪. **সরলতা ঃ** সরলতা গ্রামীণ জনসমষ্টির সদস্যদের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকৃতিগত ভাবে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা হল সহজ সরল। তাদের জীবনধারা সহজ, স্বচ্ছন্দ ও শান্তিপূর্ণ। গ্রামবাসীদের আচরণের মধ্যে শঠতা ও ভণিতা থাকে না। তাদের আচার ব্যবহার হল কৃত্রিমতাবর্জিত এবং স্বতঃস্ফুর্ত। তাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত মানের। মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাত, পেশাগত ঈর্ষান্বিত তাদের মধ্যে থাকে না।

৫. **প্রতিবেশীসুলভ আচরণ ঃ** গ্রামের জনগণের পরিলক্ষিত হয় প্রতিবেশীসুলভ আচরণ। জনসংখ্যার ঘনত্ব কম, একে অপরকে চেনে ও জানে, খোঁজ খবর রাখে, নেয় পরস্পর পরস্পরের সুখে দুঃখে পাশে এসে দাঁড়ায় ফলে এক গভীর প্রতিবেশীসুলভ মানসিকতাবোধের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া তাঁদের জীবনের গতি অত্যন্ত শ্লথ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ বড় একটা দেখা যায় না।

৬. **ধর্মীয় ভাব ঃ** গ্রামীণ জনসমষ্টির মধ্যে ধর্মভাবের প্রাধান্য আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অধিবাসীরা সাধারণতঃ ধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে। তাদের জীবনধারা, বিশ্বাস, অনুভূতি ধর্মীয় আদর্শে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তারা

অতিমাত্রায় প্রকৃতি নির্ভর ও ধর্ম ভীরু। তাঁদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্ম এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অবিসংবাদিত প্রভাব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় ।

৭. **দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা ঃ** গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা এবং এক ধরনের এক গোয়েমীভাব পরিলক্ষিত হয়। পারিবারিক প্রথা প্রকরণ ও রীতিনীতির সঙ্গেই গ্রামবাসীদের সম্পর্ক গভীর ও ওতপ্রোত। গ্রামীণ জনসম্প্রদায়ের বাইরের জগতের সঙ্গে তারা সংযোগ সম্পর্ক নেই বললেই চলে। তার ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে নিজেদের জীবনধারাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এক দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। নিজেদের বিশ্বাস ও দৃষ্টি ভঙ্গি সম্পর্কে তাঁরা অন্ধ আবেগপূর্ণ সনাতন ও সুনির্দিষ্ট।

৮. **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও মর্যাদা ঃ** পল্লী এলাকার সামাজিক মর্যাদা মানুষের ব্যক্তিগত গুণাগুণের পরিবর্তে তার পরিবারের আয়,সম্পত্তি, পেশা ইত্যাদি বিবেচনায় নির্ণীত হয়ে থাকে। এক কথায় সেখানে সামাজিক মর্যাদা আরোপ করা হয় কাউকে তা অর্জন করতে হয় না।

অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ়। সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রচলিত নিয়মাবলী পালনের মাধ্যমেই সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। গ্রামের প্রধানকে সকলেই মান্য করে।

৯. **স্বনির্ভর গ্রাম সংস্থা ঃ** গ্রাম সম্প্রদায়গুলি ছিল স্বনির্ভর গ্রাম সংস্থা। এদের জীবন নির্বাহের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুই এরা গ্রাম থেকে পূরণ করতে পারতো। বাইরের কোন সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন পড়েনি। গ্রামে সব পেশার লোক বাস করতো এবং যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম ছিল।

১০. **জনমিতিক গুণাবলী ঃ** গ্রামীণ জনসমষ্টির অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে থাকে। অধিকাংশ লোক গরীব, কোনক্রমে মোটাভাত মোটা কাপড়ে দিন যাপন করে থাকে। অন্যদিকে অধিকাংশ মানুষই নিরক্ষর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। পরিবারের আয়তন শহরের তুলনায় অনেক বড়। বিশেষ করে শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে অধিক।

৪.৪ঃ৫ শহরে জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য

শহুরে জনসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল -

১. **বৈপরীত্যের সমাবেশ ঃ** শহরে জনসম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈপরীত্য বর্তমান। শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যক্তিগত বৃত্তি, সাংস্কৃতিক জীবন, ধ্যান ধারণা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রবণতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক বিচার বিবেচনায় এখানে শ্রেণী বৈষম্য প্রকট। কিছু অঞ্চল আছে আকাশচুম্বী অট্টালিকা। আবার কোন কোন অংশে আছে ছেঁড়া কাপড় ও চটের আচ্ছাদনে তৈরী করা কুঁড়েঘর। শহরাঞ্চলে কিছু মানুষ দিবারাত্র কর্মব্যস্ত, আবার অসংখ্য মানুষ কর্মহীন বেকার। অফিস আদালত কল কারখানা ও বহু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মানুষ এখানে আছে। আবার কাজ নেই এমন বেকার মানুষের সংখ্যাও কম নয়।

২. **আবাসন সমস্যা ঃ** পৌর জনসমষ্টি একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যাসূচক বৈশিষ্ট্য হল আবাসনের অপ্রতুল। বাসগৃহের সমস্যা হল বড় বড় শহরগুলির একটি মৌলিক সমস্যা ও সমস্যাদি প্রকটভাবে বিদ্যমান। আবাসনের অভাবে দীন-দরিদ্র ও খেটে খাওয়া অসংখ্য মানুষ খোলা আকাশের নিচে শহরের ফুটপাতে রাত কাটায়। এই কারণে শহরে খুব একটা যৌথ পরিবার দেখা যায় না। এখানে দম্পতিকেন্দ্রিক একক পরিবার পরিলক্ষিত হয়। এইসব নানাকারণে সন্তান সংখ্যা খুব কম।

৩. **বিচ্ছিন্ন অবস্থান ঃ** শহর জনসমষ্টিসমূহ সাধারণতঃ বৃহদায়তনবিশিষ্ট হয় এবং জনপদগুলি অত্যন্ত জনবহুলও হয়। স্বভাবতই এই ধরণের জনসম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে প্রাথমিক সম্পর্ক বা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা সম্ভব নয় এবং থাকেও না। শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সাধারণতঃ বড় একটি পারস্পরিক আলাপ পরিচয় থাকে না। এতদসত্ত্বেও অফিসে আদালতে, বাসে, রাস্তাঘাটে, বাজারে তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। সাধারণত অভিন্ন বিষয়ে এবং পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধার স্বার্থে এ ধরনের কথাবার্তা হয়ে থাকে। এ ধরনের সম্পর্কের মধ্যে আন্তরিকতা ও

মানসিকতার অভাব অনস্বীকার্য। পৌর জনসম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ও সম্পর্ক নিতান্তই আংশিক মোটেই সম্পূর্ণ নয়। এমন নজির অসংখ্য আছে যে, একই শহরে সুদীর্ঘকাল বসবাস করার পরও কোন ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে চিনে না। বস্তুতঃ বিচ্ছিন্ন অবস্থান এবং অজ্ঞাতনামা অবস্থা হল শহরাঞ্চলে অধিবাসীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪. **সামাজিক দূরত্ব ও যান্ত্রিক সম্পর্ক ঃ** শহরে জনসমষ্টি সদস্যদের মধ্যে সামাজিক দূরত্বের অস্তিত্ব লক্ষ্যনীয়। সামাজিক ক্ষেত্রে এই দূরত্বের কারণ হিসেবে বৈপরীত্যের সমাবেশ এবং শহরবাসীদের অজ্ঞাতনামা অবস্থার কথা বলা হয়। শহর সম্প্রদায় গঠিত হয় বহু ও বিভিন্ন ধরনের মানুষ নিয়ে। জনপদের বা এলাকার মানুষ পরস্পরের কাছে অচেনা থাকে। শহরাঞ্চলের মানুষদের মধ্যে এক ধরনের শিথিল সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যা বহুলাংশে যান্ত্রিক। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হৃদতাপূর্ণ বা আন্তরিকতা পরিবেশ একেবারেই থাকে না। শহরের মানুষদের পেশাগত ও অন্যান্য কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে, তাঁদেরকে রুটিনমাফিক চলতে হয়। দিবাগত রাতে অল্পক্ষণের সময় নিজের পারিবারিক কাজে সময় কাটাতে হয়। তাই সামাজিক সম্পর্ক অত্যন্ত শিথিল।

৫. **সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্নধর্মিতা ঃ** একটি শহরে এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্নধর্মী মানুষের সমাবেশ গড়ে উঠে। স্বভাবতই এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিতি হয়। বৃত্তি আচার বিচার, সাংস্কৃতিক জীবনধারা ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে জাতি বর্ণ, সভ্যতা, সংস্কৃতি আচার, আচরণ, ফ্যাশন, চাল-চলনে, কথাবার্তায় মনমানসিকতায় বৈচিত্র্যের বিকাশ ঘটে এবং বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করা হয়। ফলশ্রুতিতে এক ভিন্ন ধর্মী সংস্কৃতি ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

৬. **গতি এবং উৎসাহ উদ্দীপনা ঃ** শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারায় গতি ও উৎসাহ উদ্দীপনার আধিক্য অনস্বীকার্য। পৌর জনসম্প্রদায়ের মধ্যে জীবনের গতিবেগ বেশী। শহরবাসীদের মধ্যে উচ্চবিলাসী মানুষের সংখ্যা অধিক। তাঁরা ক্রমান্বয়ে অধিকতর আর্থিক সঙ্গতির স্বার্থে দিবারাত্র উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় আশ-পাশের মানুষ জনের মধ্যেও এ উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। এক্ষেত্রে শহরব্যাপী এক প্রতিযোগীতার পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়। সমৃদ্ধি লাভের বাসনায় শহরবাসীরা বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করে। এভাবে তাদের মধ্যে এক মানসিক চাপ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তারা এক ধরনের অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাববোধে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

৪.৪ঃ৬ গ্রামীণ ও শহুরে জনসমষ্টির মধ্যে পার্থক্য

১. অর্থনৈতিক কার্যাবলির দিক দিয়ে শহর ও গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। পল্লীর অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। সকলে কৃষিকাজ করে ও উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জড়িত। অন্যদিকে শহরের লোকের পেশা হচ্ছে অফিস আদালত, কারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষকতা, ডাক্তারী ও উকালতি।

২. গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় প্রাথমিক সম্পর্কের (Primary relations) প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় অন্যদিকে শহরে জনসমষ্টি মধ্যে গৌণ সম্পর্কে (Secondary Relations) প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ গ্রামবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গতা ও নির্ভরশীল হয় শহরবাসীদের মধ্যে এই সম্পর্ক ও শিথিল, কেউ কারো মুখোমুখী চিনে না, মিশে না।

৩. গ্রামীণ জীবনে সামাজিক সচলতার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে নগরজীবনে সামাজিক সচলতার সুযোগ-সুবিধা বিশেষভাবে বর্তমান।

৪. গ্রামীণ জীবনে ভৌগোলিক দূরত্ব কিন্তু সামাজিক নৈকট্য ও আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। অন্যদিকে শহর এলাকায় ভৌগোলিক নৈকট্য কিন্তু সামাজিক দূরত্ব গড়ে উঠে। অর্থাৎ পাশাপাশি বসবাস করেও নিজেদের মধ্যে আমরা বোধ সম্পর্ক গড়ে উঠে না।

৫. আধুনিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করায় শহরের বাসিন্দাগণ অনেকটা কুসংস্কারমুক্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকের সঙ্গে মেশামেশা ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ পায় তাই তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে। অন্যদিকে শিক্ষার অভাবে পল্লীবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সংকীর্ণ। বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ না থাকায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বড় হয় না।

৬. পল্লীর অধিবাসীরা অত্যন্ত ধর্মভীরু, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার, অনুষ্ঠান উৎসবে তারা বিশ্বাসী তার চেয়ে বেশী বিশ্বাসী কুসংস্কারে তার জাগতিক স্বার্থের চেয়ে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে অনেক বেশী গুরুত্ব দেয়। অন্যদিকে শহরের লোকেরা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মূল্যবোধকে অনেক বেশী গুর□ত্ব দেয়।

৭. পল্লী সমাজ স্থবির ও স্থিতিশীল। পল্লীবাসী তাদের পেশা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করতে চায় না এবং সচরাচর ভিটে বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হয় না। তারা কোন পরিবর্তনকে স্থানান্তরিত করতে চায় না। কিন্তু শহরে সমাজ দ্র□ত *পরিবর্তনশীল। তারা যে কোন পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।*

৮. গ্রামীণ অঞ্চলে সদস্যদের উপর কার্যকর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় মাতুব্বর-মুরব্বী, মৌলভী, চেয়ারম্যান তারাই সালিশী ও বিচার আচার করে থাকে। কিন্তু শহর এলাকায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল, শহরবাসীরা সকলেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধে বিশ্বাসী। এখানে আইনর ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

৯. গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র জনসম্প্রদায়ের সদস্যদের উপর পরিবারের প্রভাব প্রতিপত্তি বেশি। পরিবারের এই প্রভাব প্রতিপত্তি শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের উপর তেমন একটি পরিলক্ষিত হয় না।

১০. গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারা সাধারণ সহজ সরল এবং বৈচিত্র্যের অনুপস্থিত। কিন্তু শহরাঞ্চলে জীবনধারণ বৈচিত্র্য অনাড়ম্বরপূর্ণ ও ব্যয়বহুল।

১১. গ্রামীণ সমাজের লোকসংস্কৃতি সহজ সরল অনাড়ম্বর প্রকৃতির কিন্তু শহরে সমাজের সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ উত্তেজক আড়ম্বরযুক্ত ও কৃত্রিম প্রকৃতির।

১২. গ্রামীণ জনসমষ্টির মধ্যে নারীর ভূমিকা সাধারণতঃ গৃহের কাজকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অপরপক্ষে শহরে নারীর ভূমিকার পরিবর্তন ঘটেছে। তাছাড়া নারী ও পুরুষের আনুপাতিক হারের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারতম্য ঘটেছে।

১৩. পরিবার ব্যবস্থা, বিবাহের ধরণ, জনসংখ্যার আধিক্য, বিনোদনমূলক ব্যবস্থার মধ্যে শহর এলাকার ও গ্রামীণ এলাকার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। গ্রামে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা, বিবাহের ক্ষেত্রে পরিবারভিত্তিক অনুষ্ঠান ও বায়োজ্যেষ্ঠদের মতামত প্রাধান্য পেয়ে থাকে। সন্তান জন্মদান ও শিশু মৃত্যুহার প্রসূতি মৃত্যুহার বেশি। বিনোদনমূলক সুযোগ-সুবিধা একেবারেই অপ্রতুল। কিন্তু শহর এলাকায় অনু পরিবার ও বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র/পাত্রীর মতামতের প্রাধান্য, কমিউনিটিতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিনোদন মাধ্যমগুলিও অনেক বেশি।

সার-সংক্ষেপ

জনসমষ্টি কখন কিভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে তা সঠিকভাবে বলা কঠিন, তবে দলবদ্ধভাবে মানুষ যখন এক স্থানে বসবাস করেছে তখন থেকেই জনসমষ্টি সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণতঃ জনসমষ্টি বলতে একই নির্দিষ্ট এলাকায় সহযোগিতা ও সংহতিবোধ নিয়ে সমস্বার্থ, সমস্থান, সমজীবনযাত্রা, সমআদর্শ, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার উদ্বুদ্ধ হয়ে একত্রে বসবাস করে থাকে। আধুনিককালে আমরা দু'ধরনের জনসমষ্টি লক্ষ্য করি তাহচ্ছে শহরে জনসমষ্টি ও গ্রামীণ জনসমষ্টি। শহরে জনসমষ্টি হচ্ছে এক বৃহৎ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে যেখানে ধর্ম, ভাষা, আচার-আচরণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জীবনে চাকচিক্যময় বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ক ও দূরত্ব শিথিল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অধিক ব্যবহৃত হয় এবং জীবনে বৈপরীত্য বিদ্যমান বেশী থাকে। অন্যদিকে গ্রামীণ জনসমষ্টি হচ্ছে চারিদিকে চাষাবাদ জমি পরিবেষ্টিত আবাসস্থল যেখানে জনগণের মধ্যে নিবিড় আত্মি সম্পর্ক পারস্পরিক সহযোগিতাবোধ, একই ধরনের মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও যৌথ পরিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. জনসমষ্টি ধারণা সৃষ্টি হয় -

ক. ১৮৭০ সালে
খ. ১৫৭৫ সালে
গ. ১৯২১ সালে
ঘ. সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই

২. আধুনিককালে জনসমষ্টিকে সাধারণত -

ক. ৪ ভাগে ভাগ করা যায়
খ. ৩ ভাগে ভাগ করা যায়
গ. ২ ভাগে ভাগ করা যায়
ঘ. ৬ ভাগে ভাগ করা যায়।

৩. জনসমষ্টি বলতে -

ক. একই স্থানে বসবাসকারী সমস্বার্থ, সমআচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও সংহতিবোধকে বুঝায়
খ. বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী লোকসংখ্যাকে বুঝায়
গ. পার্বত্যঞ্চলের আদিবাসীদেরকে বুঝায়
ঘ. বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশের লোকসংখ্যাকে বুঝায়।

উত্তরমালা -

১. ঘ. সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই ২. গ. ২ ভাগে ভাগ করা যায়
৩. ক. একই স্থানে বসবাসকারী সমস্বার্থ, সমআচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও সংহতিবোধকে বুঝায়

পাঠ-৪.৫ ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি লিখতে পারবেন

- ☞ ৪.৫ঃ১ ধর্ম কি?
- ☞ ৪.৫ঃ২ ধর্মের বৈশিষ্ট্য
- ☞ ৪.৫ঃ৩ ধর্মের সামাজিক ভূমিকা/গুর□ত্ব।

৪.৫ঃ১ ধর্ম কি? ধর্মের অর্থ

ধর্ম একটি মৌল ও সার্বজনীন মানবীয় প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর সব সমাজে সর্বাবস্থায়ই ধর্মের অস্তিত্ব ছিল। নৃ-বিজ্ঞানী মার্তক বলেন, "সর্ব সমাজই কোন না কোন পন্থায় অতি প্রাকৃত শক্তিকে তোষামোদ করে এবং নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানদি পালন করে। পৃথিবীর সব সমাজেই মানুষের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টক্রিয়া, মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে ঘিরে অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠান, ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। এসব বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান থেকে ধর্মের আবির্ভাব"।

'ধর্ম' শব্দটির উৎপত্তি ধৃ-ধাতু থেকে। এই অর্থে যা মানুষকে ধারণ করে তাই হল ধর্ম। কিন্তু ব্যাপক অর্থে মানুষের জীবনধারাকে ধারণ করে আসছে বহু ও বিভিন্ন সামাজিক প্রথাপদ্ধতি ও আচার অনুষ্ঠান। সুতরাং বুৎপত্তিগত অর্থে ধর্মের ধারণা সঠিকভাবে অনুধাবন করা অসম্ভব। বস্তুতঃ ধর্মের ধারণাটি অত্যন্ত জটিল। কোন একটি বিশেষ সংজ্ঞার সাহায্য ধর্মের সংজ্ঞা সংঘটিত করা যায় না। তাই ধর্মের অর্থ সম্যকভাবে অনুধাবন করার জন্যে বিভিন্ন দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীর সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক।

জেমস ফ্রেজার (James G. Frazer) তাঁর 'The Golden Boug' শীর্ষক গ্রন্থে ধর্মের সংজ্ঞায় বলেছেন ধর্ম হল মানুষের থেকে উন্নত বিভিন্ন শক্তি যা প্রকৃতির ধারা এবং মানবজীবনের গতিপথ নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করে বলে বিশ্বাস করা হয় তাদের প্রসন্নতা বা সন্তুষ্টি সাধন। (Religion is the belief in powers superior to man which are believed to direct and control the course of nature and human life.)

অধ্যাপক ম্যাকাইভার (R.M. Maciver) অভিমত অনুসারে ধর্ম কেবলমাত্র মানুষের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি কর তা নয়, ধর্ম মানুষ ও অন্য কোন উর্ধ্বশক্তির মধ্যে সম্পর্কের সৃষ্টি করে। (Religion, as we understand the term, implies a relationship not merely between mass and man but also between mass and some higher Power.)

অধ্যাপক অগবার্ণ ও নিমকফ (W.P Ogburn and M.P. Nimkoff) তাঁদের 'A Handbook of Sociology' শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "Religion is attitude towards super human powers"। এমিল ডর্কুহেইম (Emile Dur Kheim) মতানুসারে "ধর্ম হল বিশেষ একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলো পবিত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে এবং এই সমস্ত পবিত্র বিষয় সমাজে স্বতন্ত্র ও নিষিদ্ধ অবস্থায় বর্তমান থাকে। অন্যদিকে ম্যাকোঞ্জ (Mckenzie) তাঁর "Outline of Social Philosophy" শীর্ষক গ্রন্থে ধর্মের সামাজিক আদর্শের দিকটির উপর জোর দিয়েছেন। ধর্ম বলতে তিনি সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট সত্তার প্রতি মানুষের চূড়ান্ত অনুরাগ অনুরক্তিকে বুঝিয়েছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে ধর্ম হল মানবজীবনের পূর্ণ নৈতিক শুদ্ধতার উদ্দেশ্য আন্তরিক অনুরক্তি বা উদ্যেগ। নৃ-বিজ্ঞানী টেইলরের মতে, "Religion is the belief in spirit being" অর্থাৎ ধর্ম হচ্ছে অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস। তিনি আত্মভূত, প্রেত, দৈত্য-দানব ইত্যাদিকে বিশ্বাস স্থাপন করাকে ধর্ম বলেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সমাজদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মানুষের থেকে মহৎ ও উন্নত এক শক্তিতে বিশ্বাস ও আস্থাই হলো ধর্ম। এই বিশ্বাস ও আস্থার ভিত্তিতে কিছু অনুভূতির সঞ্চার হয় এবং সৃষ্টি হয় কিছু কার্য প্রক্রিয়ার। এর সঙ্গে বিভিন্ন পার্থিব অথবা অপার্থিব ব্যক্তিগত আশা-আকাংখা প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে জড়িয়ে আছে। সুতরাং ধর্মের ২টি দিক আছে। (১) ধর্মের অন্তরঙ্গ (২) ধর্মের বহিরঙ্গের মহত্তর বা উচ্চতর ঈশ্বরীয়/আল্লাহর শক্তিতে বিশ্বাস ও ধারণার ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় কিছুভাব, অনুভূতি, চেতনা, প্রত্যয় ইত্যাদির। এইগুলো ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক হিসেবে বিবেচিত। ধর্মের এই সমস্ত অন্তরঙ্গ বিষয়াদির অভিব্যক্তি ঘটে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই সমস্ত আচার অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে বলে ধর্মের বহিরঙ্গের দিক। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মের এই বহিরঙ্গ নিয়মিত হয়ে থাকে।

৪.৫ঃ২ ধর্মের বৈশিষ্ট্য

ধর্মের ধারণা সম্পর্কিত উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে ধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো ঃ

১. কোন না কোন অতি মানসিক, অতি প্রাকৃত ও উচ্চতর সত্তার প্রতি বিশ্বাস।
২. পার্থিব অথবা অপার্থিব কোন কিছু পাওয়ার আশায় বা কল্যাণ সাধনের স্বার্থে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে এই পরমসত্তার উপর নির্ভর করে থাকে।
৩. ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এ অন্তরঙ্গ বা অভ্যন্তরীণ শক্তির উপর বিশ্বাস করে মানুষের মনে আবেগ, অনুভূতি, ভয়-ভীতি, প্রেম-শ্রদ্ধা ইত্যাদি।
৪. প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব কিছু আবার অনুষ্ঠান, উৎকর্ষ, প্রার্থনা ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ আদর্শ ও মূল্যবোধ রয়েছে। এই সমস্ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান হল ধর্মের বাহ্যিক বা বাহিরের দিক।
৫. সকল ধর্মেই কতকগুলো কাজকর্ম পাপ হিসাবে চিহ্নিত থাকে। পাপীর শাস্তি অবশ্যই হবে এবং পাপীর উপর ঐশ্বরিক অভিশাপ বর্ষিত হয়। পাপীকে এই অভিশাপ বা শাস্তি ভোগ করতে হবে।
৬. প্রতিটি ধর্মের প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্মের নির্দেশ বা বিধান থাকে।
৭. ধর্মের একটা ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক রয়েছে। ব্যক্তিগত দিক হল নিজস্ব বিশ্বাস, আত্মোপলব্ধি, আত্মিকাশ, নিজস্ব জীবন ধারনের দৃষ্টিভঙ্গি। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি ধর্মের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন প্রথা রয়েছে।

৪.৫ঃ৩ ধর্মের সামাজিক ভূমিকা (Social Role of Religion)

সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত অনুসারে মানব সভ্যতার কর্মস্থলে ধর্মের অস্তিত্ব বর্তমান। স্বভাবতই ধর্মের ব্যর্থতা মানবসভ্যতাকে বহুলাংশে বিপন্ন করে তোলে। মানুষের ব্যক্তি জীবনের অনেকাংশ জুড়ে আছে ধর্মের অস্তিত্ব এটি অনস্বীকার্য। ব্যক্তিজীবনে এবং সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকার গুরুত্ব বাদ দিলেও রাজনীতিক, প্রশাসনিক ও বিচারকার্যে শপথ গ্রহণের যে রীতি পরিলক্ষিত হয় সে ক্ষেত্রেও ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। নিম্নে ধর্মের সামাজিক ভূমিকা আলোচনা করা হলে -

ক. **নিরাপত্তাবোধ ও সান্তনার সঞ্চার ঃ** ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর ধর্মবিশ্বাস কার্যকরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের জীবন দর্শন বা জীবনের অর্থ অনেকাংশে ধর্ম বিশ্বাসের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়ে যায়। হতাশা, ভীতি ও বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে ধর্ম মানুষকে রক্ষা করে। সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজ জীবনকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ধর্মের এই ভূমিকার গুর□ত্ব *অপরিসীম। এ বিষয়ে বিরোধ বিতর্কের অবকাশ নেই। সমাজ জীবনে মানুষ বহুবিধ যন্ত্রণার মধ্যে* পড়ে। ধর্মবোধ এ ধরনের যাবতীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়। দৈবদুর্বিপাক, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজজীবনে আকস্মিকভাবে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং ঘটে। মানুষ যখন হতাশাগ্রস্থ হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ রকম অসহায় অবস্থায় হতাশাগ্রস্থ মানুষের আশু প্রয়োজন হল নিরাপত্তাবোধের ব্যবস্থা করা। এ রকম পরিস্থিতিতে মানুষের মনে ধর্মশক্তি ও সান্তনার সঞ্চার করে এবং আশা ও বিশ্বাস জাগায়। আবার আবেগতাড়িত মানুষের উপরও ধর্মীয় আবেদন কার্যকারিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খ. **নীতি ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা ঃ** ধর্ম মানুষের চরিত্র গঠন করে এবং তা কার্যকরীভাবে সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে। আদিম সমাজের মত আধুনিক সমাজেও ধর্মের এই ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। সুস্থ সমাজ জীবনের স্বার্থে নীতিও আদর্শকে যথাযথ মূল্য ও গুরুত্ব প্রদান করা এবং তার সংরক্ষণ ও বিস্তারের ব্যবস্থা করা দরকার । এক্ষেত্রে ধর্মই সহায়ক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। ধর্মই সমাজে নীতি ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করে। ধর্ম সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের বাহ্যিক আচার ব্যবহারকে সংযত করে এবং এই পথে তাদের নৈতিক উন্নতি করে। যে সমস্ত ব্যক্তি সমাজে নীতিভ্রষ্ট, তারা সমাজে ধর্মচ্যুত বলেও বিবেচিত হয়। স্বভাবতই প্রচলিত মূল্যবোধ প্রসঙ্গে সমাজে কোন রকম বিরোধ বিতর্ক দেখা দেয় না। মানুষের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ধর্ম উন্নত করে এবং এই পথে ধর্ম ব্যক্তি মানুষের চেতনাকে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন, হৃদয়কে পবিত্র ও চিত্তকে শুদ্ধ করে। ধর্মবোধের প্রভাব সমাজের সদস্যদের সহনশীল, সহানুভূতিসম্পন্ন, পরোপকারী এবং মমত্ববোধ যুক্ত করে তোলে। ধর্ম মানুষকে চিন্তায় ও আচারণে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে এবং সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। অসৎ পথ পরিহার করে সৎ পথে চলতে ধর্ম মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। আবার সমাজবদ্ধ মানুষ যাতে সামাজিক নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে মান্য করে চলে এবং সামাজিক দায় দায়িত্ব যত্নসহকারে পালন করে সে ব্যাপারে ধর্ম সকলকে উজ্জীবিত করে।

গ. **ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবহারিক জীবনকে প্রভাবিত করে ঃ** সমাজবদ্ধ মানুষের সংস্কৃতি ও বস্তুজগতকে ধর্ম বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মানুষের ধর্মবোধ ও শিক্ষার সঙ্গে তার ব্যবহারিক জীবনের সংযোগ সম্পর্ক অনস্বীকার্য। এই সংযোগ সম্পর্কের কারণে সমাজের সদস্যদের বাস্তব জীবনকে ধর্ম প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে। ইতিহাসের গতিধারা নিয়ন্ত্রণে সাম্রাজ্যের উত্থান, পতন ঘটাইতে যুদ্ধের সূচনা ও যুদ্ধের অবসান সৃষ্টিতে, শিক্ষা, সাহিত্য সঙ্গীতের প্রকৃতি নির্ধারণে বিভিন্ন রীতির সৃষ্ট পরিবার ও যৌন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে, এক কথায় মানবজীবনের প্রায় সকল কর্মতৎপরতার উপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারে ধর্মের শক্তিশালী প্রভাবকে লক্ষ্য করা যায়।

ঘ. **সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি ঃ** সমাজের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতিও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ এবং ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মসজিদ, গীর্জা, মঠ-মন্দির ইত্যাদি দর্শীয় সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হলেও সামাজিক সংগঠন হিসেবে এগুলোর অনন্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সমাজের সদস্যদের সমাবেশ ঘটে। যেমন - মসজিদে শুক্রবারে জুমার নামাজ আদায় করতে অনেক মানুষ সমাগত হয়ে থাকে। এই সমাগম ও মেলামেশা সূত্রে সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও আন্তরিকতা। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছেন যে, "The church at the some time a fellowship, a brother bood to believers, basis of social intercourse."

ঙ. **সামাজিক ঐক্য ও সংহতির বিকাশেও সংরক্ষণ ঃ** সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ধর্ম সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংহতি সাধনের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। যথার্থ ধর্মবোধ সামাজিক ঐক্যও সংহতি স্থাপনের কাজকে সহজতর করে। সমাজজীবনে ধর্ম সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সাধনের শক্তি হিসাবে বিশেষভাবে সজীব ও সক্রিয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্যদের সমবেত করে, এবং এই সমাবেশ সূত্রে তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এ বিষয়ে ডর্কুহেইম ম্যালিনাউস্কি প্রমুখ চিন্তাবিদগণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। ডর্কুহেইম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের তাৎপর্য উল্লেখ করে বলেন যে, "সামাজিক সংহতিকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লেখযোগ্য উপাদান"। ধর্মবোধের মধ্যেই মানুষের ক্ষুদ্র অহং -এর বিলুপ্তি ঘটে এবং বৃহৎ অহং-এ উত্তরণের পথ প্রশস্ত হয়। মানুষ ধর্ম বোধের ভিত্তিতে সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে উঠতে পারে এবং বৃহত্তর জীবনে সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে পারে। যথার্থ ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ মানুষের মধ্যে ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতি, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। তেমনিভাবে তা বিকশিত হয়ে থাকে। যেমন, ধর্মীয় উৎসব, ঈদ, পূজা, খ্রীস্টমাস প্রভৃতি ধর্মোৎসব বিপুল ও ব্যাপক আনন্দ আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এখানে ধনী দরিদ্র, শ্রেণী-বর্ণ ভেদাভেদ থাকে না, সকলেই একে অন্যের সাথে ঈদের মাঠে নামাজ আদায় করে, কোলাকুলি করে, আনন্দ উপভোগ করে থাকে। এভাবে একটি সম্প্রীতি ও সংহতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবার অনেকে মনে করেন যে, ধর্মবোধ বিশ্ব শান্তি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির সহায়ক।

চ. **জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে ঃ** ধর্মবোধে ব্যক্তি মানুষকে আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে থাকে। সকল সমাজব্যবস্থাতেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাতব্য ও জনসেবামূলক বহুবিধ কাজকর্ম পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত জনতিহকর কাজকর্মের পিছনে ধর্মীয় মনোভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সততা বর্তমান থাকে। সমাজজীবনে জনকল্যাণ ও সমাজসেবামূলক বহুবিধ কার্যকলাপ দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে দর্শনবোধের ইতিবাচক অবদান অনস্বীকার্য। "জীবসেবা হল শিবসেবা স্বামী বিবেকানন্দের এই মহানবাণী ধর্মপ্রথা যে কোন মানুষকে জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে। প্রাকৃতিক সামাজিক অথবা রাজনীতিক বিপদের বা দূঃসময়ে মানুষ অসহায় ও হতাশা হয়ে পড়ে। এই রকম অসময়ে ধর্মীয় সংস্কৃতিসমূহ আর্তমানুষের পাশে দাঁড়ায় এবং জনসেবামূলক বহু ও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংগঠনমূলক হাসপাতাল, বিদ্যালয়, প্রসুতিসদন, অতিথিসদন, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি দাতব্য সংস্থা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এবং পরিচালনার ব্যবস্থা করে।

ছ. **ললিতকলার সমৃদ্ধি ঃ** ধর্মের আবেদন সঙ্গীত-সাহিত্য ললিতকলা প্রভৃতি উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানুষ বিভিন্ন সময়ে সাড়া জাগানো সঙ্গীত, সাহিত্য চিত্রকলা ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে। এই সমস্ত সৃষ্টির পিছনে ধর্মবোধের অনুপ্রেরণা অনস্বীকার্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নির্মিত বহুবিধ শিল্পকর্ম, ভাস্কর্য, সৌধ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। বিস্ময়কর শিল্প কর্মের নিদর্শন হিসেবে আধুনিককালের মানুষকে অভিভূত করে এমন অনেক মঠ-মন্দির, মসজিদ, গীর্জা প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমান। ধর্মীয় অনুপ্রেরণার ভিত্তিতেই বিশ্বের এই সমস্ত বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ

ধর্ম একটি মৌল ও সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান - যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে সকল সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান। ধর্মের অতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি মানুষের বিশ্বাস, যা মানবজীবনে গতিধারা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে এবং মানব সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা করে। ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাকৃতিক শক্তির উপর বিশ্বাস করে মানুষের মনে আবেগ ভয়ভীতি, অনুভূতি প্রেম শ্রদ্ধা জন্মায়। পার্থিব বা অপার্থিব কল্যাণ সাধনের আশায় মানুষ এই চরম প্রাকৃতিক শক্তির উপর বিশ্বাস করে। ধর্মের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ২টি দিক রয়েছে। অভ্যন্তরীন দিক হচ্ছে ধর্মের প্রতি ব্যক্তি নিজস্ব বিশ্বাস, আত্মোপলব্ধি, আত্মিকাশ, নিজস্ব জীবন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাহ্যিক দিক হলো প্রতিটি ধর্মের সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন প্রথা রয়েছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষকরে মানসিক পরিতৃপ্তি, সমাজে নীতি আদর্শ প্রতিষ্ঠা, সম্প্রীতি সৌহাদ্যপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি, সমাজে ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণ, মানবসেবায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং সর্বোপরি মানবজীবনের দৈনন্দিন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫

সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুন

১. ধর্ম হচ্ছে এক ধরনের অতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস যা মানুষের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।
২. আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে।
৩. ধর্মের মূলতঃ ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক রয়েছে।
৪. প্রতিটি ধর্মেরই নিজস্ব আদর্শই মূল্যবোধ রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে।
৫. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি এবং জনসেবায় উদ্বুদ্ধকরণে ধর্মের কোন ভূমিকা নেই।

উত্তরামালা - ১. সত্য ২. মিথ্যা ৩. সত্য ৪. মিথ্যা ৫. মিথ্যা

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. ধর্ম একটি -
ক. অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান
খ. সার্বজনীন মানবীয় প্রতিষ্ঠান
গ. বিশেষ গোত্রীয় প্রতিষ্ঠান
ঘ. ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান।

২. ধর্মের সামাজিক ভূমিকা হচ্ছে-
ক. সমাজকে অস্থিতিশীল করে
খ. নিরাপত্তাবোধ ও সান্তনার সঞ্চার করে
গ. মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়
ঘ. ব্যবহারিক জীবনকে কলুষিত করে।

উত্তরমালা - ১. খ. সার্বজনীন মানবীয় প্রতিষ্ঠান ২. খ. নিরাপত্তাবোধ ও সান্তনার সঞ্চার করে

পাঠ-৪.৬ ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন

- ☞ ৪.৬ঃ১ রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায়?
- ☞ ৪.৬ঃ২ রাষ্ট্রের উপাদান কি কি?
- ☞ ৪.৬ঃ৩ রাষ্ট্রের কার্যাবলি
- ☞ ৪.৬ঃ৪ রাষ্ট্রের গুরুত্ব

৪.৬ঃ১ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা/রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায়

রাষ্ট্র একটি বাস্তব রাজনৈতিক সংগঠন। কোন মানুষই রাষ্ট্র ব্যতীত বসবাস করতে পারে না। রাষ্ট্রের মধ্যেই আমাদের জীবন ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে রাষ্ট্র। এজন্য রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নিয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।

অধ্যাপক বার্জেস বলেন, " রাষ্ট্র মানব জাতির এমন একটি অংশ যা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদিগুরু এ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় বলেন, "কতিপয় গ্রাম ও পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনই রাষ্ট্র।"

ব্লুন্টস্লির মতে, "কোন নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজই রাষ্ট্র।"

সুতরাং যে রাজনৈতিক সংগঠনের নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, সু-সংগঠিত সরকার, সার্বভৌম আদিপত্য এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনসমষ্টি রয়েছে তাকে রাষ্ট্র বলে।

৪.৬ঃ২ রাষ্ট্রের উপাদান

রাষ্ট্রের মূল উপাদান চারটি। কোন মানব-সংঘকে রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হতে হলে এই চারটি উপাদান থাকা অপরিহার্য, যথা- (১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, (৩) সরকার এবং (৪) সার্বভৌমত্ব বা স্বাধীনতা।

(১) **জনসমষ্টি ঃ** জনসমষ্টি রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান। জনসমষ্টি ব্যতীত রাষ্ট্রকে কল্পনা করা যায় না। জনমানবহীন মর□ভূমিতে *বা অরণ্যে রাষ্ট্রগঠন করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও জনসাধারণের ইচ্ছা বাস্তবায়নের* মধ্যে স্থায়ী জনসমষ্টি অপরিহার্য। ভাসমান যাযাবর উপজাতি কখনো রাষ্ট্র গঠন করতে পারে না। তবে জনসংখ্যা কত হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই। রাষ্ট্র ভেদে জনসংখ্যা কম-বেশি হতে পারে। যেমন ঃ চীনের জনসংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি, আবার বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি। তবে একটি স্বাভাবিক রাষ্ট্রের জনসংখ্যা সেই রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও প্রাপ্ত সম্পদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হওয়াই কাম্য।

(২) **নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড ঃ** নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান। নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড বলতে শুধু রাষ্ট্রের স্থলভাগকে বোঝায় না। স্থলভূমি, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের নদ-নদী, রাষ্ট্র সীমানায় প্রবাহিত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি সাগর ও মহাসাগরের জলসীমা এবং স্থলভূমি ও জলভূমির উপরিস্থিত আকাশ সীমা রাষ্ট্রীয় ভূ-খন্ডের অন্তর্ভূক্ত। ভূ-খন্ডের আয়তন কতটুকু হবে তার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। যেমন- পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মোনাকে। যার আয়তন ২.৫ বর্গ কিলোমিটার। আবার বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃ মিঃ।

(৩) **সরকার ঃ** রাষ্ট্রের অবশ্যই সরকার থাকবে যা রাষ্ট্রের নীতিমালা প্রকাশিত প্রণীত ও কার্যকরী করে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সরকারই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে রাষ্ট্রের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করে থাকে। অবশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার বিভিন্ন রূপ হতে পারে। তবে সরকারের রূপ বা প্রকৃতি কি হবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত কোন নিয়ম নেই। সরকারের রূপ যাই হোক না কেন সরকারকে এমন শক্তিশালী হতে হবে যাতে এটি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রয়োজনীয় সেবাকর্ম সম্পাদন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা করতে পারে।

(৪) **সার্বভৌমত্ব বা স্বাধীনতা ঃ** সার্বভৌমত্ব বা স্বাধীনতা হলো রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। সার্বভৌম ক্ষমতার সংস্পর্শে একটি জনসংগঠন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সার্বভৌম ক্ষমতার দু'টি দিক আছে। প্রথমটি হলো অভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়টি হলো বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হতে স্বাধীন। সার্বভৌমত্ব অবিভাজ্য, অহস্তান্তর যোগ্য এবং চরম ক্ষমতা।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্র একটি চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান। এর পরিবর্তন ঘটতে পারে কিন্তু তাই বলে এর বিনাশ হয় না। ইহাকে অন্যান্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন হতে স্বীকৃতি পেতে হয়। স্বীকৃতির পর প্রত্যেকটি রাষ্ট্র সমান অধিকার ও মর্যাদা দাবী করতে পারে।

৪.৬ঃ৩ রাষ্ট্রের কার্যাবলি

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ জনকল্যাণের সর্বাধিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দু'টো শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা ঃ (ক) অপরিহার্য কার্যাবলি এবং (খ) ঐচ্ছিক কার্যাবলি।

(ক) অপরিহার্য কার্যাবলি ঃ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি এবং জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রকে যে সকল কাজ করতে হয় তাকে অপরিহার্য কাজ বলে। রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

১. **দেশ রক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি ঃ** দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ। দেশ রক্ষা সংক্রান্ত কাজের জন্য রাষ্ট্র স্থল বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনী গঠন ও পরিচালনার মাধ্যমে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলে।

২. **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যাবলি ঃ** রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রতিবেশী ও দূরের রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তি, প্রগতি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, সামরিক চুক্তি, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৈত্রী ইত্যাদি পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ রাষ্ট্র সম্পাদন করে।

৩. **অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি ঃ** রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও সংহতি রক্ষার জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা অপরিহার্য। জনসাধারণের জান ও মালের নিরাপত্তা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র আইন শৃঙ্খলা বিধান করে। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র পুলিশ বাহিনী ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে।

৪. **প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি ঃ** ক্ষমতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এবং সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রকে প্রশাসন কাঠামো নির্মাণ এবং একদলীয় স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ ও পরিচালনা করতে হয়। রাষ্ট্র তার প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে খাজনা ও কর আদায় করে, বাজেট প্রণয়ন করে এবং মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনা করে। সরকারি কর্মকর্তাগণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

৫. **আইন প্রণয়ন ও বিচার সংক্রান্ত কাজ ঃ** আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায় বিচারের মাধ্যমে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে এবং বিচার আদালত গঠন ও পরিচালনা করে।

খ) ঐচ্ছিক কার্যাবলি ঃ বর্তমানে কোন রাষ্ট্রই পুলিশী রাষ্ট্র নয়। সকল রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে নাগরিকদের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করতে চায়। সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত সমাজকল্যাণ কাজ করে তাকে ঐচ্ছিক কাজ বলে। রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. **শিক্ষা বিস্তার ঃ** শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। জাতিকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র শিক্ষা বিস্তার সংক্রান্ত বহুবিধ কাজ করে। যেমন - নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সরকারি ও বে-সরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করা।

২. **জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ঃ** জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করে। মহামারী ও সংক্রামক রোগ, যেমন - ম্যালেরিয়া, বসন্ত, যক্ষ্মা উচ্ছেদ ও নির্মূল অভিযান পরিচালনা করে এবং কলেরা ও অন্যান্য ব্যধির প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক দেওয়ার ব্যবস্থা করে। পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য নলকূপ খনন, পুকুর খনন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে।

৩. **যোগাযোগ রক্ষা ঃ** দেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগ রক্ষা এবং যাতায়াত ব্যবস্থা সংরক্ষণ করার জন্য সড়ক, রেলপথ, বিমান, নৌ-চলাচল, ডাক, তার ও টেলিফোনের ব্যবস্থা করে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র বিমান, ডাক, তার ও টেলিফোনের ব্যবস্থা করে।

৪. **শিল্প ও বাণিজ্য ঃ** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবিত উন্নতির ফলে শিল্প সংক্রান্ত কাজগুলো প্রায় ব্যক্তির সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। বর্তমানে রাষ্ট্র বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র শিল্প কারখানা স্থাপন এবং জনকল্যাণের জন্য ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য অর্থ ও পুঁজি বিনিয়োগ সংগঠনগুলো পরিচালনা করে।

৫. **শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত কাজ ঃ** রাষ্ট্র শ্রমিকদের কাজের সময়, মেয়াদ, মজুরী নির্ধারণ এবং শ্রমিক বিরোধের নিস্পত্তির জন্য মজুরী বোর্ড ও শ্রম আদালত স্থাপন করে। শ্রমিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ও শ্রমিক সংঘ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে।

৬. **সামাজিক নিরাপত্তা ঃ** জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলো আজ অবসর প্রাপ্তদের পেনশন, কল্যাণ ভাতা ও যৌথ বীমা, দুঃস্থদের সাহায্য, বয়স্ক ভাতা, বেকার ভাতা ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বহুবিধ কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

৭. **জনহিতকর কার্যাবলি ঃ** জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কৃষি, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থা ও পুনর্বাসন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্র যথোপযুক্ত কার্যাদি সম্পাদন করে।

অতএব সার্বিকভাবে বলা যায় যে, বর্তমানে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাষ্ট্র জরুরী ভিত্তিতে এ সকল কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে ।

৪.৬ঃ৪ রাষ্ট্রের গুরুত্ব

প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে রাষ্ট্র মানব জীবনে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান হয়েও রাষ্ট্রই সমাজ জীবনের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। রাষ্ট্র সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখে সকলের অত্যাচার হতে দুর্বলকে রক্ষা করে। আপামর জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষণ করে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে।

রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানুষ তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থ সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়। রাষ্ট্রই সামাজিক জীবনের সামগ্রিক উদ্দেশ্যকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। শিল্পায়ন শহরায়নের ফলে উদ্ভূত সামাজিক অবস্থায় পরিবারসহ অনেক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি রাষ্ট্রের ওপর বর্তেছে। আধুনিককালে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্যে ও শিল্প বাণিজ্যের সম্প্রসারণসহ সকল প্রকার জনহিতকর কার্য রাষ্ট্রের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রতিককালে কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা প্রসারের ফলে জনগণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধানের দায়িত্বও রাষ্ট্র গ্রহণ করে নিয়েছে।

অ্যাডামস্মিথ বলেন রাষ্ট্রের কাজ প্রধানতঃ তিনটি -

১. সামাজিক অন্যায় ও অত্যাচার থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করা
২. ব্যক্তিকে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করা
৩. বহিরাক্রমন থেকে দেশকে রক্ষা করা।

সার-সংক্ষেপ

রাষ্ট্র ব্যতীত পৃথিবীর কোন স্থান নেই। ভৌগোলিক এলাকা নির্ধারণ ও সার্বভৌমত্ব ও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির জন্যে একটি নির্দিষ্ট সীমানা প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টির। সুতরাং নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড সুসংগঠিত সরকার, এবং সার্বভৌম আদিপাত্য ও স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনসমষ্টি নিয়ে গঠিত হয় একটি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রধানতঃ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা, জানমালের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা, পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন, প্রশাসনিক কার্যাবলী, জনস্বাস্থ্য কার্যাবলী, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও সকল আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. রাষ্ট্র মূলতঃ একটি —
   ক. সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান খ. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
   গ. স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ঘ. আন্তর্জাতিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান

২. রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান হচ্ছে —
   ক. ৪টি খ. ৬টি
   গ. ৮টি ঘ. ১টি

৩. রাষ্ট্রের কার্যাবলী শুধুমাত্র —
   ক. আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা
   খ. পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন করা
   গ. জনগণের মৌল মানবিক চাহিদাপূরণ ও মৌল অধিকার নিশ্চিতকরণ
   ঘ. উল্লেখিত সকল কিছুই।

উত্তরমালা -

১. ক. সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান
২. ক. ৪টি
৩. ঘ. উল্লেখিত সকল কিছুই।

অনুশীলনী

ইউনিট - ৪

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. বিবাহ বলতে কি বুঝেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহের গুরুত্ব / প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
২. বিবাহের সংজ্ঞা দিন। বিবাহের প্রকারভেদগুলি আলোচনা করুন।
৩. পরিবারের সংজ্ঞা দিন। আধুনিক পরিবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
৪. পরিবারের শ্রেণী বিভাগগুলো / প্রকারভেদগুলো আলোচনা করুন। পরিবারের বিভিন্ন ধরণগুলো কী কী?
৫. আধুনিক সমাজে পরিবারের কার্যাবলী / ভূমিকা আলোচনা করুন।
৬. জ্ঞাতিসম্পর্ক বলতে কি বোঝায়? জ্ঞাতি সম্পর্কের শ্রেণী বিভাগ/প্রকারভেদগুলো আলোচনা করুন।
৭. সামজ জীবনে জ্ঞাতি সম্পর্কের গুরুত্ব/ভূমিকা আলোচনা করুন।
৮. শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক ও বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্কের পার্থক্যগুলো উল্লেখ করুন।
৯. জনসমষ্টি বলতে কি বোঝায়? জনসমষ্টির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাম সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১০. গ্রামীণ জনসমষ্টি বলতে কি বোঝায়। গ্রামীণ জন সমষ্টির বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।
১১. শহরে জনসমষ্টি বলতে কি বোঝায়? শহরে জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।
১২. গ্রামীণ ও শহরে জনসমষ্টির মধ্যকার পার্থক্যগুলো কী?
১৩. ধর্মের সংজ্ঞা দিন ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি কী?
১৪. মানব জীবনে / সামাজিক জীবনে ধর্মের ভূমিকা আলোচনা করুন।
১৫. রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায়? রাষ্ট্রের উপাদানগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
১৬. আধুনিক সমাজে রাষ্ট্রের কার্যাবলীসমূহ আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

১. আধুনিক কালে বিবাহের শ্রেণী বিভাগগুলো কী কী?
২. পরিবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী?
৩. পরিবারের আকার অনুযায়ী কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
৪. জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরণগুলো কী কী?
৫. গ্রামীণ জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
৬. শহরে জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
৭. ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
৮. রাষ্ট্রের উপাদানগুলি কী?
৯. রাষ্ট্রের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।